বাঘাযতীন

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দস্যি ছেলে জ্যোতি সারাদিন অপেক্ষা করে—কখন দিনের শেষে মা তাকে নিয়ে যাবেন গড়ুই নদীতে স্নান করতে। কী শীত, কী বর্ষা, মায়ের ভ্রূক্ষেপ নেই। শাড়ির একমুড়ো জ্যোতির কোমরে বেঁধে অন্য মুড়োটা বজ্রমুষ্টিতে ধরে শিবরাত্রির সলতে এই একমাত্র ছেলেকে তিনি ছুড়ে ফেলে দেন জোয়ারের জলে। ঢেউগুলো ফণা মেরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আর আপ্রাণ লড়তে লড়তে জ্যোতি যখন প্রায় অবসন্ন হব হব, সুপটু সাঁতারুর মতো মা তিরের বেগে এগিয়ে গিয়ে ছেলেকে তুলে নিয়ে যান।

এইভাবে জ্যোতি শেখে বিপদকে তুচ্ছ করতে।

রাতের বেলায় দিদি বিনোদবালার সঙ্গে শান্ত জ্যোতি মায়ের কোল জুড়িয়ে শোয় আর শোনে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের গল্প, রাণাপ্রতাপ, শিবাজি, সীতারাম রায়, প্রতাপাদিত্যের কাহিনি। বীরত্বের এসব কাহিনি শুনে বুকটা যেন তার টনটন করে। তেমনি প্রহ্লাদের গল্পে, চৈতন্য, নানক, কবীরের

কথায় মন ভ'রে ওঠে তার ভক্তিতে। ভীষণ তার রাগ আর দুঃখ হয় ইংরেজদের হাতে দেশের লোক কীভাবে কষ্ট পাচ্ছে, সে বৃত্তান্ত শুনে।

'আমি কিন্তু, মা, বড়ো হয়ে এদের সবার দুঃখ ঘুচিয়ে দেব,' বলতে বলতে ঘুমের দেশে চলে যায় জ্যোতি।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই মামাদের সঙ্গে জ্যোতি যায় কুস্তির আখড়ায়। গট্টিয়া গ্রাম থেকে যাদুমাল ওস্তাদ এসে তালিম দেয়। দেখতে দেখতে খাসা তাগড়া চেহারা হলো জ্যোতির।

ন-মামা অনাথের ছিল নানারকম কসরতের অভ্যাস। আর ঘোড়ায় চড়া, শিকার, দৌড়-ঝাঁপ প্রভৃতিতে তাঁর ভারি দখল। জ্যোতি এসব দিক থেকে তাঁর প্রিয় শাগরেদ। মামার সাদা ঘোড়া 'সুন্দরী'র পিঠে সওয়ার হয়ে প্রায়ই উধাও হয়ে যায় জ্যোতি।

মাঝে মাঝে শিলাইদহ থেকে কবি রবি ঠাকুরের ভাইপো সুরেন ঘোড়াটা ধার নিতে এসেই মামা আছেন অথচ ঘোড়া নেই দেখে হাসিমুখে প্রশ্ন করতেন : 'জ্যোতি বুঝি বেড়াতে গেছে?'

জ্যোতি ঘোড়া চড়তে অত ভালোবাসে দেখে মামা একটা টাট্টু ঘোড়া কিনে দিলেন তাকে। লাগাম ছাড়াই তার পিঠে চেপে ন-বছরের জ্যোতি গ্রামের কাদামাঠ পার হয়ে যায় সাতারার দুর্গের স্বপ্নে বিভোর হয়ে।

এমন সময়ে বড়োমামার সঙ্গে এল একদিন ফেরাজ খাঁ—চাটুজ্যে-বাড়ির পাহারাদার হয়ে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ফেরাজের বাড়ি। লাঠি, ছোরা, তরোয়াল, বন্দুক চালাতে অতি দক্ষ সে। ফেরাজের জন্য বড়োমামা আলাদা একটা ঘর দিলেন চণ্ডীমণ্ডপের ওধারে। আর তার হাতে দিলেন বাড়ির ছেলেদের খেলাধুলো শিক্ষার ভার।

কেউ কেউ বলেন যে এই আফ্রিদি ফেরাজ-কে দেখেই রবি ঠাকুর প্রেরণা পেয়েছিলেন তাঁর 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে কয়ার চাটুজ্যেবাড়ির তিন-চার পুরুষের সম্পর্ক। বড়োমামা বসন্তকুমারের মক্কেল ও বন্ধু ছিলেন রবি ঠাকুর।

ফেরাজের কাছে জ্যোতি খবর পেল যে শত অত্যাচারেও তার মুলুকের কেউ ইংরেজকে মেনে নেয়নি রাজা বলে। তারা প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসে তাদের স্বাধীনতাকে। এই স্বাধীনতার জন্য মরতে তারা ডরে না, মারতে তারা পিছপা নয়।

গ্রামের পাঠ এবার শেষ হলো জ্যোতির।

বড়োমামা তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে ভরতি করালেন কৃষ্ণনগরের অ্যাংলো ভার্নাকুলার হাইস্কুলে। ওখানেই বড়োমামা ওকালতি করেন তখন।

পড়াশোনায় জ্যোতির মাথা খুব সাফ। দুষ্টু বুদ্ধিতেও সে দড়। কদিনের মধ্যেই ইস্কুলের দামালদের সে পাণ্ডা হয়ে উঠল। কিন্তু তার দুষ্টুমির মধ্যে নেই বিন্দুমাত্র শয়তানির ছোঁয়া।

ইস্কুলের বাগানে বড়ো কাঁঠাল পেকেছে। গন্ধে মেতে উঠছে সবার মন। যথেষ্ট ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সহপাঠীদের কারো সাহস হচ্ছে না এক-আধটা কাঁঠাল পেড়ে খাবার। তাই দেখে জ্যোতির মগজে খেলে গেল নতুন একটা মতলব।

'অ্যাই, আজ ইস্কুল ভাঙলেই চলে যাস না; মজা করা যাবে সবাই মিলে,' চুপি চুপি সবার কানে কানে এই কথা সে রটিয়ে দিল।

স্কুল ভাঙল।

বন্ধুদের দু-তিনজনকে নিয়ে বেশ কয়েকটা পাকা পাকা কাঁঠাল পেড়ে মহা ফুর্তিতে ভোজ বসিয়ে দিল জ্যোতি।

পরদিন হেডমাস্টারের কাছে নালিশ গেল।

'কে কাঁঠাল চুরি করেছ?' ক্লাসে ক্লাসে গিয়ে তিনি জানতে চাইলেন। কেউই অপরাধ স্বীকার করতে নারাজ। তাই দেখে জ্যোতি কবুল করল — সে একাই কাঁঠাল পেড়েছে এবং বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে খেয়েছে। কিন্তু যেহেতু এগুলো তাদেরই ইস্কুলের গাছের ফল, সেজন্য ওগুলো পেড়ে খাওয়াকে চুরি বলে সে মানতে পারে না!

জ্যোতির সত্যকথা বলবার সাহস আর তার যুক্তির ধরন দেখে হেডমাস্টার হাসি চেপে ধমক দিলেন: 'আর এমন কোরো না।'

সবাই রেহাই পেল।

উপরন্তু পরের বছর গাছের কাঁঠাল পাকতেই নিজে থেকে হেডমাস্টারমশাই মালি দিয়ে ভালো ভালো কাঁঠাল পাড়িয়ে ছেলেদের পিকনিক লাগিয়ে দিলেন।

১৮৯৩ সালে ঘটল একটা ঘটনা। জ্যোতির বয়স তখন চোদ্দো।

কৃষ্ণনগরের বাজারে সে গিয়েছে কাগজ-পেনসিল কিনতে। নদিয়া ট্রেডিং কোম্পানির এক দোকানে সে দাম মিটিয়ে দিচ্ছে, এমন সময় তার কানে এল — এক দারুণ হই-হল্লা।

দোকান থেকে জ্যোতির চোখ পড়ল — পথচারী সবাই ছুটে পালাচ্ছে। একটা পাগলা ঘোড়া বেরিয়েছে রাস্তায়।

অদূরে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মাঝপথে দাঁড়িয়ে কাঁদছে এক শিশু।

জ্যোতি মনস্থির করে ফেলল।

একলাফে রাস্তায় নেমে শিশুটি আর ঘোড়ার মাঝামাঝি যেতে না যেতেই ঘোড়া এসে পড়ল প্রায় তার ঘাড়ের কাছে। তিরবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে জ্যোতি চেপে ধরল ঘোড়ার কেশর। আচমকা বাধা পেয়ে শিষ-পা হয়ে ঘোড়টা জ্যোতিকে ফেলে দিতে চেষ্টা করল কয়েকটা ঝটকা দিয়ে।

জ্যোতি ততক্ষণে উঠে বসেছে ঘোড়ার পিঠে।

অত্যন্ত শান্ত ভঙ্গিতে ঘোড়ার পিঠে গলায় দাবনায় ছোটো ছোটো চাপড় মেরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো থমকে দাঁড়িয়ে ঘোড়াটা উপভোগ করতে লাগল জ্যোতির আদর। থেকে থেকে কাঁপুনি জাগল তার সারা গায়ে।

এমন সময় ঘোড়ার সহিস বেরিয়ে এল ভিড় ঠেলে; স্থানীয় উকিল বারাণসী রায়ের আস্তাবল থেকে ঘোড়াটা পালিয়ে এসেছে। সহিসের হাত থেকে লাগাম নিয়ে ঘোড়ার গলায় পরিয়ে দিয়ে জ্যোতি যেই নেমে এল — ধন্য ধন্য পড়ল চারিদিকে।

কিছুই হয়নি এমনভাবে জ্যোতি চলে গেল তার নিজের পথে।

সারা দেশে সেদিন ছড়িয়ে পড়ল কৃষ্ণনগরের এই কাহিনি। মহা গর্বে বড়োমামা বসন্তকুমার লোক পাঠিয়ে খবর দিলেন শরৎশশীকে।

উৎসবে-পার্বণে বড়োমামার সঙ্গে জ্যোতিও গ্রামে ফেরে। পড়াশোনা নির্দোষ দুষ্টুমি ছাড়াও তার একটা নেশা ছিল। লালন ফকিরের শিষ্য অন্ধ বাউল পাঁচু ফকিরের আখড়ায় গিয়ে তন্ময় হয়ে সে শোনে বাউলের গান।

জ্যোতির আরও দুটো নেশার মধ্যে ছিল ফুটবল খেলা আর যাত্রা কিংবা শখের থিয়েটারে অভিনয় করা। বাড়িতে পালা-পার্বণে সবাই মিলে প্রায়ই নাটক করে; জ্যোতি, তার ছোটোমামা ললিত, বন্ধু ভবভূষণ মিত্র, কুঞ্জলাল সাহা, আরও অনেকে।

জ্যোতির সবচেয়ে প্রিয় ভূমিকা ছিল — ভক্ত হনুমান, লক্ষ্মণ, রাজা হরিশচন্দ্র , বীর প্রতাপাদিত্য ! ... বহুবার তাকে দেখা গিয়েছে বড়োমামার পাগড়ি চুরি করে বানিয়েছে হনুমানের লেজ।

দুর্গোৎসবের চার দিন মামাবাড়িতে নিত্য রাঁধা হতো আজকের হিসাবে প্রায় চারশো কিলোগ্রাম ওজনের চালের ভাত। এই ভাত রাঁধতেও জ্যোতি ও তার সাঙ্গোপাঙ্গের উৎসাহ অপরিসীম। প্রসাদ পেতে আহূত - রবাহূত কম লোকের সমাগম হতো না চাটুজ্যে-বাড়িতে।

ভদ্রলোকদের জন্য রেওয়াজ ছিল সাদা ভাত আর অন্যান্য প্রজাদের জন্য ঘরের লাল চালের ভাত পরিবেশনের।

একদিন এক জেলে প্রজা কিন্তু কিন্তু করে একটু সাদা ভাত চেখে দেখতে চাইল। শুনে জ্যোতির বড়ো মায়া হলো। ছোটোমামার সঙ্গে গিয়ে সে বসন্তকুমারকে ধরল — পরদিন থেকে সবার জন্যই এল সাদা ভাত।

নবমীর দিনে প্রজারা নানারকম বল-পরীক্ষা খেলা দিয়ে সবাইকে আনন্দ দেয়। তাদের ভিড়ের মধ্যে প্রায়ই হুট করে এসে হাজির হয় জ্যোতিবাবু; একটা নারকোল বুকে নিয়ে উপুড় হয়ে সে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকে— আট-দশটা সাজোয়ান প্রজা মিলেও তার কাছ থেকে ফলটা কেড়ে নিতে পারে না।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে জ্যোতি ও তার ছোটোমামার ব্যবস্থায় জাতি-বর্ণ ভুলে গ্রামের সবাই বসলেন একসঙ্গে পঙ্‌ক্তি-ভোজনে : হিন্দু, মুসলমান, বামুন, চাঁড়াল সবাই খেলেন মহাতৃপ্তিতে মায়ের প্রসাদ।

হাতে কলমে

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯৩৬ —) : বাঘাযতীনের পৌত্র পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পন্ডিচেরীর অরবিন্দ আশ্রম থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘকাল সমাজ ও ইতিহাসের গবেষক হিসেবে কাজ করেছেন। *পুরোধা* নামক কিশোর পত্রিকার তিনি প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। গবেষণা ও সাংবাদিকতা সূত্রে বহুদিন বিদেশে ছিলেন। তিনি বাঘাযতীন বিষয়ক একাধিক বইয়ের লেখক। তাঁর অনান্য আরো কয়েকটি বই হলো *সমসাময়িকের চোখে শ্রী অরবিন্দ*, *আলোর চকোর* প্রভৃতি।

১. পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কার পৌত্র ?

২. তাঁর লেখা একটি বইয়ের নাম লেখো।

৩. **শিলাইদা শব্দটি এসেছে 'শিলাইদহ' থেকে। অর্থাৎ 'দহ' পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে 'দা'। নীচের নামগুলি পরিবর্তিত হয়ে কী হবে লেখো :**

শিয়ালদহ = ____ **বেলদহ =** ____ **খড়দহ =** ____

এরকম কয়টি শব্দ তুমি জানো লেখো।

৪. **জ্যোতিকে মা যে যে গল্প শোনান —**

২.১ ____ ২.২ ____

২.৩ ____ ২.৪ ____

শব্দার্থ : মুড়ো — মাথা। বজ্রমুষ্টি — শক্ত মুঠি। শিবরাত্রির সলতে — একমাত্র অবলম্বন। বৃত্তান্ত — বিবরণ। তালিম — শিক্ষা, অনুশীলন। খাসা — চমৎকার। তাগড়া — বলিষ্ঠ। কসরত — কৌশল, কায়দা। শাগরেদ — শিষ্য। সওয়ার — আরোহী। শিলাইদা — 'শিলাইদহ'- র কথ্য রূপ, বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ স্থান, এক কালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। টাট্টু ঘোড়া — ছোটো ঘোড়াবিশেষ। বিভোর — মুগ্ধ, আত্মহারা। মুলুক — দেশ। পিছপা — পিছিয়ে যাওয়া। ডরে না — ভয় করে না। দামাল — দুষ্টু। হুট করে — হঠাৎ করে। সাজোয়ান প্রজা — এখানে 'পালোয়ান' অর্থে ব্যবহৃত। পঙ্‌ক্তিভোজন — একসারিতে বসে খাওয়া। চাঁড়াল — চণ্ডাল শব্দের কথ্যরূপ।

৫. **নীচের দুটি স্তম্ভের শব্দ গুলিকে বিপরীত শব্দ অনুযায়ী মেলাও :**

ক	খ
শেষ	রাত্রি
দিবস	অনপেক্ষা
অপেক্ষা	অশান্ত
জোয়ার	শুরু
শান্ত	পরাধীনতা
দু:খ	সুখ
স্বাধীনতা	ভাটা

৬. জ্যোতি যে যে চরিত্রে অভিনয় করতে ভালোবাসে সেগুলির নাম লেখো ।

৭. গল্পটি পড়ে জ্যোতির যে কাজগুলিকে দু:সাহসিক বলে মনে হয়েছে সেগুলি বর্ণনা করো।

৮. স্কুলের বাগানে বড়ো কাঁঠাল পেকেছে। এখানে 'পাকা' ক্রিয়াপদটি যে-অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সেই অর্থ ছাড়া তোমরা আর কী কী অর্থে ব্যবহার করতে পারো লেখো :

যেমন— গ্রামে অনেক পাকা বাড়ি আছে।

৯. **কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়াগুলিকে তাদের ঘরে বসাও :**

৯.১ একটি টাট্টু ঘোড়া কিনে দিলেন মামা।

৯.২ যাদুমালা ওস্তাদ কুস্তি শেখায়।

৯.৩ মা সাঁতার শেখাতেন।

৯.৪ জ্যোতি বাউল গান শোনে।

কর্তা	কর্ম	ক্রিয়া

১০. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

১০.১ জ্যোতির মায়ের নাম কী?

১০.২ মা জ্যোতিকে কোন নদীতে স্নান করাতে নিয়ে যেতেন?

১০.৩ রবি ঠাকুরের ভাইপো কে?

১০.৪ জ্যোতির ন' মামার নাম কী?

১০.৫ ফেরাজ খাঁ-এর বাড়ি কোথায় ছিল?

১০.৬ জ্যোতির বড়োমামার পেশা কী ছিল?

১০.৭ জ্যোতি কোন স্কুলে ভরতি হয়েছিল?

১০.৮ ১৮৯৩ সালে জ্যোতির বয়স ছিল ১৪। কত সালে জ্যোতির ৭ বছর বয়স ছিল?

১১. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

১১.১ জ্যোতি কীভাবে সাঁতার শিখেছিল?

১১.২ কৃষ্ণনগর স্কুলে জ্যোতির কাঁঠাল পাড়ার কাহিনিটি বর্ণনা করো।

১১.৩ কৃষ্ণনগরে জ্যোতি কীভাবে একটি শিশুকে বাঁচিয়েছিল সেই কাহিনিটি লেখো।

১১.৪ জ্যোতির জীবনে তাঁর মা ও দিদির ভূমিকার কথা লেখো।

১১.৫ পাঠ্যাংশে জ্যোতির জীবনে তাঁর মামাদের প্রভাব কেমন ছিল?

১১.৬ জ্যোতির মামাবাড়ির সঙ্গে রবিঠাকুরের সম্পর্ক কী ছিল?

১১.৭ 'ফেরাজের কাছে জ্যোতি খবর পেল'—কে এই ফেরাজ? তাঁর কাছ থেকে জ্যোতি কী খবর পেল?

১১.৮ পাঠ্যাংশ থেকে খুঁজে নিয়ে জ্যোতির শিশুসুলভ/কিশোরসুলভ চাপল্যের উদাহরণ দাও।

১১.৯ 'কিছুই হয়নি এমনভাবে জ্যোতি চলে গেল তার নিজের পথে' — কোন ঘটনার পর জ্যোতি এমনভাবে চলে গিয়েছিল?

১১.১০ জাতপাতের ক্ষুদ্র সংকীর্ণতা ছোটোবয়েসেই কীভাবে জ্যোতি অতিক্রম করতে পেরেছিল?

১১.১১ পাঠ্যাংশে জ্যোতির নানা ধরনের কাজের যে পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে, তা নিয়ে তুমি নিজের ভাষায় একটি অনুচ্ছেদ রচনা করো।

জেনে রাখো :

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বাঘাযতীন (১৮৭৯-১৯১৫) জন্ম মাতুলালয়ে। অধুনা বাংলাদেশের কুষ্ঠিয়ার কাছে কয়া গ্রামে। পিতৃনিবাস যশোহরের রিশখালি গ্রামে। পিতা উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মা শরৎশশী দেবী। তাঁরা আলোচনা করে সন্তানের নাম রাখেন 'জ্যোতি', যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ছোটোবেলা থেকেই অসমসাহসী যতীন্দ্রনাথকে 'বাঘাযতীন' নামটি দিয়েছিলেন তাঁর গুরুদেব তাঁকে বলেছিলেন 'শূরবীর—শের কা বাচ্চা'। পাঠ্যাংশে সেই বীরবিপ্লবী বাঘাযতীনের শৈশব আর কৈশোরের কথা শুনিয়েছেন তাঁরই পৌত্র পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সম্ভবত সে কারণেই পারিবারিক সূত্রে আদর করে পাওয়া ছোটোবেলার 'জ্যোতি' নামটিই লেখক তাঁর রচনায় ব্যবহার করেছেন।

আদর্শ ছেলে

কুসুমকুমারী দাশ

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে?
কথায় না বড়ো হয়ে কাজে বড়ো হবে;
মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন,
'মানুষ' হইতে হবে,—এই তার পণ।

বিপদ আসিলে কাছে, হও আগুয়ান,
নাই কি শরীরে তব রক্ত, মাংস, প্রাণ?
হাত, পা সবারই আছে, মিছে কেন ভয়,
চেতনা রয়েছে যার, সে কি পড়ে রয়?

সে ছেলে কে চায় বলো?—কথায় কথায়,
আসে যার চোখে জল, মাথা ঘুরে যায়।
সাদা প্রাণে হাসি মুখে করো এই পণ—
'মানুষ' হইতে হবে, মানুষ যখন।

কৃষকের শিশু কিংবা রাজার কুমার,
সবারই রয়েছে কাজ, এ বিশ্বমাঝার,
হাতে প্রাণে, খাটো সবে, শক্তি করো দান,
তোমরা 'মানুষ' হলে, দেশের কল্যাণ।

হাতে কলমে

কুসুমকুমারী দাশ (১৮৭৫—১৯৪৮) : কবি জীবনানন্দ দাশের মা। তিনি নিজেও সেই সময়ের বিশিষ্ট মহিলা কবি ও সুলেখিকা। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম *কবিতা মুকুল*। এছাড়া *পৌরাণিক আখ্যায়িকা* নামক একটি গদ্যগ্রন্থও তিনি রচনা করেন। *প্রবাসী*, *ব্রহ্মবাদী*, *মুকুল* প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর রচিত অসংখ্য কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লেখা কবিতার ভাষা সরল এবং ভাব সহজ তাই সাধারণ পাঠক তা অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে।

১. কুসুমকুমারী দাশের কবিতা কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হতো?

২. তাঁর রচিত একটি গদ্য গ্রন্থের নাম লেখো।

৩. **নীচের শব্দগুলির বর্ণ-বিশ্লেষণ করো। একটি ছক করে তার ঠিক ঠিক ঘরে হ্রস্বস্বর, দীর্ঘস্বর এবং বর্গীয় বর্ণগুলিকে বসাও:**

আমাদের, আগুয়ান, প্রাণ, কৃষক, বিশ্বমাঝার, কল্যাণ।

৪. এই কবিতায় মানুষের যে যে অঙ্গের নাম পেয়েছ সেগুলি বের করে প্রতিটির তিনটে করে সমার্থক শব্দ লেখো।

৫. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

৫.১ নাই কি ____ তব রক্ত, মাংস, প্রাণ?

৫.২ ____ রয়েছে যার, সে কি পড়ে রয়?

৫.৩ আসে যার চোখে জল, ____ ঘুরে যায়।

৫.৪ কৃষকের শিশু কিংবা ____।

৫.৫ মুখে হাসি, বুকে ____, তেজে ভরা মন।

৬. **কবিতার পঙক্তিগুলিকে গদ্যরূপে লেখো :**

৬.১ বিপদ আসিলে কাছে, হও আগুয়ান।

৬.২ আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে?

৬.৩ সবারি রয়েছে কাজ, এ বিশ্বমাঝার।

৬.৪ 'মানুষ' হইতে হবে, মানুষ যখন।

৬.৫ নাই কী শরীরে তব রক্ত, মাংস, প্রাণ?

৭. **নীচের শব্দগুলিতে কোন কোন অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, ঘোষ ও অঘোষ বর্ণ আছে লেখো :**

কথা, মুখ, প্রাণ, মানুষ, দান, চোখ।

৮. **নীচের বাক্যগুলির কর্তা/ক্রিয়া/কর্ম চিহ্নিত করে লেখো :**

৮.১ আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে ?

৮.২ 'মানুষ' হইতে হবে, - এই তার পণ।

৮.৩ সে ছেলে কে চায় বলো?

৮.৪ সবারই রয়েছে কাজ, এ বিশ্বমাঝার।

৮.৫ তোমরা 'মানুষ' হলে, দেশের কল্যাণ।

কর্তা	কর্ম	ক্রিয়া

৯. **নীচের বাক্য/বাক্যাংশগুলির থেকে সর্বনাম খুঁজে নিয়ে তা দিয়ে আলাদা বাক্য রচনা করো :**

৯.১ নাই কি শরীরে তব রক্ত, মাংস, প্রাণ?

৯.২ চেতন রয়েছে যার, সে কি পড়ে রয়?

৯.৩ আসে যার চোখে জল।

৯.৪ সে ছেলে কে চায় বলো?

৯.৫ তোমরা মানুষ হলে দেশের কল্যাণ।

১০. **পাশের শব্দগুলির আগে বিশেষণ জুড়ে তা দিয়ে বাক্যরচনা করো :** ছেলে, বিপদ, প্রাণ, কৃষক, শক্তি, দেশ।

শব্দার্থ : বল — শক্তি। পণ — প্রতিজ্ঞা। আগুয়ান — এগিয়ে যাওয়া। কল্যাণ — মঙ্গল।

১১. **নীচের পঙ্‌ক্তিগুলিতে 'কি'-র ব্যবহার লক্ষ করো।**

- 'নাই কি শরীরে তব রক্ত, মাংস, প্রাণ?'
- 'চেতনা রয়েছে যার, সে কি পড়ে রয়?'

১১.১ **এবার তুমি 'কি' ব্যবহার করে আরো দুটি বাক্য লেখো :**

_____

_____

১১.২ **বাক্যে 'কী'-র ব্যবহার কখন হয় তা-ও জেনে নিয়ে আরো দুটি বাক্য লেখো :**

_____

_____

১২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

১২.১ ‘কথায় না বড়ো হয়ে কাজে বড়ো হবে’— বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

১২.২ ‘চেতনা রয়েছে যার সে কি পড়ে রয়?’— চেতনাসম্পন্ন মানুষ কী ধরনের কাজে এগিয়ে যায়?

১২.৩ ‘সবারই রয়েছে কাজ এ বিশ্বমাঝার।’— তুমি বড়ো হয়ে কোন কাজ করতে চাও? কেনই বা তুমি সে কাজ করতে চাও লেখো।

১২.৪ ‘আদর্শ ছেলে’ কবিতায় কবি আমাদের দেশের ছেলেদের কাছে কী প্রত্যাশা করেন?

১২.৫ প্রত্যেক দেশবাসীর কী প্রতিজ্ঞা করা উচিত?

১২.৬ দেশের জন্য অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে দেশকে স্বাধীন করেছেন, এমন কয়েকজনের নাম লেখো।

১২.৭ ‘আদর্শ ছেলে’-কে প্রধানত কোন কোন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে?

১২.৮ ‘আদর্শ ছেলে’ কবিতায় কবি যেমন ছেলেকে আমাদের দেশের জন্য চেয়েছেন, তেমন কোনো প্রিয় ‘ছেলে’-র সম্পর্কে কয়েকটি বাক্য লেখো।

উঠো গো ভারতলক্ষ্মী

অতুলপ্রসাদ সেন

অতুল প্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪) : বিখ্যাত গীতিকার, সুরকার এবং গায়ক। লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী অতুলপ্রসাদ স্বাদেশিকতা, প্রেম ও ভক্তি বিষয়ক অজস্র গানের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন।

উঠো গো ভারতলক্ষ্মী ! উঠো আজি জগৎ-জন পূজ্যা !
দুঃখ দৈন্য সব নাশি, করো দূরিত ভারত লজ্জা।
ছাড়ো গো ছাড়ো শোকশয্যা, করো সজ্জা
পুনঃ কমল-কনক-ধন-ধান্যে।
জননী গো লহো তুলি বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহো তুলি চক্ষে;
কাঁদিছে তব চরণতলে
ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো।

কাণ্ডারী নাহিক কমলা ! দুখ-লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে,
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী, কাল-সাগরকম্পন-দর্শে,
তোমার অভয়-পদ-স্পর্শে, নব হর্ষে
পুনঃ চলিবে তরণী শুভ লক্ষ্যে ।
জননী গো লহো তুলি বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহো তুলি চক্ষে;
কাঁদিছে তব চরণতলে
ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো।

ভারত শ্মশান করো পূর্ণ পুনঃ কোকিল-কূজিত-কুঞ্জে
দ্বেষ হিংসা করি চূর্ণ, করো পূরিত প্রেম অলি গুঞ্জে
দূরিত করি পাপপুঞ্জে, তপঃ ভুঞ্জে,
পুনঃ বিমল করো ভারত পুণ্যে।
জননী গো লহো তুলি বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহো তুলি চক্ষে;
কাঁদিছে তব চরণতলে
ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো ।

অষ্টম পাঠ

যতীনের জুতো

সুকুমার রায়

যতীনের নতুন জুতো কিনে এনে তার বাবা বললেন, ‘এবার যদি অমন করে জুতো নষ্ট করো তবে ওই ছেঁড়া জুতোই পরে থাকবে।’

যতীনের চটি লাগে প্রতিমাসে একজোড়া। ধুতি তার দু-দিন যেতে না যেতেই ছিঁড়ে যায়। কোনো জিনিসে তার যত্ন নেই। বইগুলো সব মলাট ছেঁড়া, কোণ দুমড়ানো, স্লেটটা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ফাটা। স্লেটের পেনসিলগুলি সর্বদাই তার হাত থেকে পড়ে যায়, কাজেই ছোটো ছোটো টুকরো টুকরো। আরেকটা তার মন্দ অভ্যাস ছিল, লেড-পেনসিলের গোড়া চিবানো। চিবিয়ে চিবিয়ে তার পেনসিলের কাঠটা বাদামের খোলার মতো খেয়ে গিয়েছিল। তাই দেখে ক্লাসের মাস্টারমশাই বলতেন, ‘তুমি কি বাড়িতে ভাত খেতে পাও না?’

নতুন চটি পায়ে দিয়ে প্রথম দিন যতীন খুব সাবধানে রইল, পাছে ছিঁড়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে নামে, চৌকাঠ ডিঙোবার সময় সাবধানে থাকে, যাতে না ঠোক্কর খায়। কিন্তু ওই পর্যন্তই। দু-দিন

পরে আবার যেই সেই। চটির মায়া ছেড়ে দুড়দুড় করে সিঁড়ি নামা, যেতে যেতে দশবার হোঁচট খাওয়া, সব আরম্ভ হলো। কাজেই এক মাস যেতে না যেতে চটির একটা পাশ একটু হাঁ করল। মা বললেন, 'ওরে, এই বেলা মুচি ডেকে সেলাই করা, না হলে একেবারে যাবে।' কিন্তু মুচি আর ডাকা হয় না। চটির হাঁ-ও বেড়ে চলে।

একটি জিনিসের যতীন খুব যত্ন করত। সেটি হচ্ছে তার ঘুড়ি। যে ঘুড়িটি তার মনে লাগত সেটিকে সে সযত্নে জোড়াতাড়া দিয়ে যতদিন সম্ভব টিকিয়ে রাখত। খেলার সময়টা সে প্রায় ঘুড়ি উড়িয়েই কাটিয়ে দিত। এই ঘুড়ির জন্য কত সময়ে তাকে তাড়া খেতে হতো। ঘুড়ি ছিঁড়ে গেলে সে রান্নাঘরে গিয়ে উৎপাত করত তার আঠা চাই বলে। ঘুড়ির লেজ লাগাতে কিংবা সুতো কাটতে কাঁচি দরকার হলে সে মায়ের সেলাইয়ের বাক্স ঘেঁটে ঘন্ট করে রেখে দিত। ঘুড়ি উড়াতে আরম্ভ করলে তার খাওয়াদাওয়া মনে থাকত না। সেদিন যতীন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেছে ভয়ে ভয়ে। গাছে চড়তে গিয়ে তার নতুন কাপড়খানা অনেকখানি ছিঁড়ে গেছে। বই রেখে চটি পায়ে দিতে গিয়ে দেখে, চটিটা এত ছিঁড়ে গেছে যে আর পরাই মুশকিল। কিন্তু সিঁড়ি নামবার সময় তার সে কথা মনে রইল না, সে দু-তিন সিঁড়ি ডিঙিয়ে নামতে লাগল। শেষে তাতে চটির হাঁ বেড়ে বেড়ে সমস্ত দাঁত বের করে ভেংচাতে লাগল। যেমনি সে শেষ তিনটা সিঁড়ি ডিঙিয়ে লাফিয়ে পড়েছে, অমনি মাটিটা তার পায়ের নীচ থেকে সুড়ুৎ করে সরে গেল, আর ছেঁড়া চটি তাকে নিয়ে সাঁইসাঁই করে শূন্যের উপর দিয়ে কোথায় যে ছুটে চলল তার ঠিকঠিকানা নেই।

ছুটতে ছুটতে ছুটতে ছুটতে চটি যখন থামল, তখন যতীন দেখল সে কোন অচেনা দেশে এসে পড়েছে। সেখানে চারদিকে অনেক মুচি বসে আছে। তারা যতীনকে দেখে কাছে এল, তারপর তার পা থেকে ছেঁড়া চটিজোড়া খুলে নিয়ে সেগুলোকে যত্ন করে ঝাড়তে লাগল। তাদের মধ্যে একজন মাতব্বর গোছের, সে যতীনকে বলল, 'তুমি দেখছি ভারি দুষ্ট। জুতোজোড়ার এমন দশা করেছ? দেখো দেখি, আর একটু হলে বেচারিদের প্রাণ বেরিয়ে যেত!' যতীনের ততক্ষণে একটু সাহস হয়েছে। সে বলল, 'জুতোর আবার প্রাণ থাকে নাকি?' মুচিরা বলল, 'তা না তো কি? তোমরা বুঝি মনে করো, তোমরা যখন জুতো পায়ে দিয়ে জোরে জোরে হাঁটো তখন ওদের লাগে না? খুব লাগে। লাগে বলেই তো ওরা

মচ্‌মচ্‌ করে। যখন তুমি চটি পায়ে দিয়ে দুড়্‌দুড়্‌ করে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করেছিলে আর তোমার পায়ের চাপে ওর পাশ কেটে গিয়েছিল, তখন কি ওর লাগেনি? খুব লেগেছিল। সেইজন্যই ও তোমাকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছে। যত রাজ্যের ছেলেদের জিনিসপত্রের ভার আমাদের উপর। তারা সে সবের অযত্ন করলে আমরা তাদের শিক্ষা দিই।' মুচি যতীনের হাতে ছেঁড়া চটি দিয়ে বলল, 'নাও, সেলাই করো।' যতীন রেগে বলল, 'আমি জুতো সেলাই করি না, মুচিরা করে।' মুচি একটু হেসে বল, 'একি তোমাদের দেশ পেয়েছ যে করব না বললেই হলো? এই ছুঁচ সুতো নাও, সেলাই করো।' যতীনের রাগ তখন কমে এসেছে, তার মনে ভয় হয়েছে। সে বলল, 'আমি জুতো সেলাই করতে জানি না।' মুচি বলল, 'আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, সেলাই তোমাকে করতেই হবে।' যতীন ভয়ে ভয়ে জুতো সেলাই করতে বসল। তার হাতে ছুঁচ ফুটে গেল, ঘাড় নীচু করে থেকে থেকে ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেল, অনেক কষ্টে সারাদিনে একপাটি চটি সেলাই হল। তখন সে মুচিকে বলল, 'কাল অন্যটা করব। এখন খিদে পেয়েছে।' মুচি বলল, 'সে কী! সব কাজ শেষ না করে তুমি খেতেও পাবে না, ঘুমোতেও পাবে না। একপাটি চটি এখনও বাকি আছে। তারপর তোমাকে আস্তে আস্তে চলতে শিখতে হবে, যেন আর কোনো জুতোর উপর অত্যাচার না কর। তারপর দরজির কাছে গিয়ে ছেঁড়া কাপড় সেলাই করতে হবে। তারপর আরো কী কী জিনিস নষ্ট করেছ দেখা যাবে।'

যতীনের তখন চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে। সে কাঁদতে কাঁদতে কোনো রকমে অন্য চটিটা সেলাই করল। ভাগ্যে এ পাটি বেশি ছেঁড়া ছিল না। তখন মুচিরা তাকে একটা পাঁচতলা উঁচু বাড়ির কাছে নিয়ে গেল। সে বাড়িতে একটা সিঁড়ি বরাবর একতলা থেকে পাঁচতলা পর্যন্ত উঠে গেছে। তারা যতীনকে সেই সিঁড়ির নীচে দাঁড় করিয়ে দিয়ে

বলল, 'যাও, একেবারে পাঁচতলা পর্যন্ত উঠে যাও, আবার নেমে এসো। দেখো, আস্তে আস্তে একটি একটি সিঁড়ি করে উঠবে নামবে।' যতীন পাঁচতলা পর্যন্ত উঠে গিয়ে নেমে এল। সে নীচে আসলে মুচিরা বলল, 'হয়নি। তুমি তিনবার দুটো সিঁড়ি এক সঙ্গে উঠেছ, পাঁচবার লাফিয়েছ, দুবার তিনটে করে সিঁড়ি ডিঙিয়েছ। আবার ওঠো। মনে থাকে যেন, একটুও লাফাবে না, একটাও সিঁড়ি ডিঙোবে না।' এতটা সিঁড়ি উঠে নেমে যতীন বেচারীর পা টনটন করছিল। সে এবার আস্তে আস্তে উপরে উঠল, আস্তে আস্তে নেমে এল। তারা বলল, 'আচ্ছা এবার মন্দ হয়নি। তাহলে চলো দরজির কাছে।'

এই বলে তারা তাকে আর একটা মাঠে নিয়ে গেল সেখানে খালি দরজিরা বসে সেলাই করছে। যতীনকে দেখেই তারা কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কী? কী ছিঁড়েছ?' মুচিরা উত্তর দিল, 'নতুন ধুতিটা দেখ কতটা ছিঁড়ে ফেলেছে।' দরজিরা মাথা নেড়ে ডেকে বলল, 'বড়ো অন্যায়, বড়ো অন্যায়! শিগগির সেলাই করে।' যতীনের আর 'না' বলবার সাহস হলো না। সে ছুঁচ-সুতো নিয়ে ছেঁড়া কাপড় জুড়তে বসে গেল। সবেমাত্র দু-এক ফোঁড় দিয়েছে অমনি দরজিরা চেঁচিয়ে উঠল, 'ওকে কি সেলাই বলে? খোলো, খোলো!' অমনি করে, বেচারি যতবার সেলাই করে, ততবার তারা বলে, 'খোলো, খোলো!' শেষে সে একেবারে কেঁদে ফেলল, বলল, 'আমার বড্ড খিদে পেয়েছে। আমাকে বাড়ি পৌঁছে দাও, আমি আর কক্ষনো কাপড় ছিঁড়ব না, ছাতা ছিঁড়ব না।' তাতে দরজিরা হাসতে হাসতে বলল, 'খিদে পেয়েছে? তা তোমার খাবার জিনিস তো আমাদের কাছে ঢের আছে।' এই বলে তারা তাদের কাপড়ে দাগ দেওয়ার পেনসিল কতগুলো এনে দিল। 'তুমি তো পেনসিল চিবোতে ভালোবাসো, এইগুলো চিবিয়ে খাও, আর কিছু আমাদের কাছে নেই।'

এই বলে তারা যার যার কাজে চলে গেল। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে যতীন কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে শুয়ে পড়ল। এমন সময় আকাশে বোঁ বোঁ করে কীসের শব্দ হলো, আর যতীনের তালি-দেওয়া সাধের ঘুড়িটা গোঁৎ খেয়ে এসে তার কোলের উপর পড়ল। ঘুড়িটা ফিসফিস করে বলল, 'তুমি আমাকে যত্ন করেছ, তাই আমি তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি। শিগগির আমার লেজটা ধরো।' যতীন তাড়াতাড়ি ঘুড়ির লেজ ধরল। ঘুড়িটা অমনি তাকে নিয়ে সোঁ করে আকাশে উঠে গেল। সেই শব্দ শুনে দরজিরা বড়ো বড়ো কাঁচি নিয়ে ছুটে এল ঘুড়ির সুতোটা কেটে দিতে। হঠাৎ ঘুড়ি আর যতীন জড়াজড়ি করে নীচের দিকে পড়তে লাগল।

পড়তে পড়তে যেই মাটিটা ধাঁই করে যতীনের মাথায় লাগল, অমনি সে চমকে উঠল। ঘুড়িটার কী হলো কে জানে। যতীন দেখল সে সিঁড়ির নীচে শুয়ে আছে, আর তার মাথায় ভয়ানক বেদনা হয়েছে।

কিছু দিন ভুগে যতীন সেরে উঠল। তার মা বলতেন, 'আহা, সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে, এই ভোগান্তিতে বাছা আমার বড়ো দুর্বল হয়ে গেছে। সে স্ফূর্তি নেই, সে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চলা নেই, কিছুই নেই। তা নইলে এক জোড়া জুতো চার মাস যায়?'

হাতে কলমে

সুকুমার রায় (১৮৮৭—১৯২৩) : উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পুত্র। শিশু সাহিত্যিক হিসেবে অসামান্য প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর রচিত বিভিন্ন বইয়ে। বাংলা শিশু সাহিত্যে তিনি নিজেই এক স্বতন্ত্র ঘরানা। হালকা হাসি ও রসিকতার মধ্যে দিয়ে কঠিন বাস্তবের ছবি এঁকেছেন তিনি। তাঁর রচনা সর্বকালের শিশুদের কাছে সমান জনপ্রিয়। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য বইগুলি হলো — *আবোল তাবোল, হ য ব র ল, পাগলা দাশু, অবাক জলপান, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, শব্দকল্পদ্রুম* ইত্যাদি। এছাড়া উপেন্দ্রকিশোরের মতোই আধুনিক বাংলা মুদ্রণশিল্পে তাঁরও বিশিষ্ট অবদান ছিল।

১. *আবোল তাবোল* বইটি কার লেখা?

২. তাঁর লেখা দুটি নাটকের নাম লেখো।

৩. **একটি বাক্যে উত্তর দাও:**

৩.১ নতুন জুতো কিনে এনে যতীনের বাবা তাকে কী বলেছিলেন?

৩.২ যতীনের স্লেট পেনসিলগুলো টুকরো টুকরো কেন?

৩.৩ যতীন কোন জিনিসটি যতদিন সম্ভব টিকিয়ে রাখত?

৩.৪ যতীন কখন রান্নাঘরে গিয়ে উৎপাত করত?

৩.৫ খেলার সময়টা সে কীভাবে কাটাতে ভালোবাসত?

৩.৬ যতীন কোথায় দরজিদের দেখা পেয়েছিল?

৩.৭ দরজিরা যতীনকে কী খেতে পরামর্শ দিয়েছিল?

৩.৮ অসহায় যতীনকে সাহায্যের জন্য শেষে কে এগিয়ে এসেছিল?

৪. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৪.১ যতীন শেষ তিনটে সিঁড়ি ডিঙিয়ে লাফিয়ে পড়ায় কী হয়েছিল?

৪.২ চটি যতীনকে মুচিদের কাছে নিয়ে গিয়েছিল কেন?

৪.৩ ‘মনে থাকে যেন, একটুও লাফাবে না, একটাও সিঁড়ি ডিঙাবে না’—কারা যতীনকে এই কথা বলেছিল? কখন বলেছিল?

৫. ‘আহা সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে, এই ভোগানিতে বাছা আমার বড় দুর্বল হয়ে গেছে।’ —যতীনের মায়ের এই ভাবনা যদি সত্যিও হয়, তবু যতীনের লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে না চলার কারণ তোমার যা মনে হয়—পাঁচটি বাক্যে লেখো।

৬. **কে কোন কথাটি বলেছে তা মিলিয়ে লেখো :**

বক্তা	কথা
১। ঘুড়ি	১। এবার যদি অমন করে জুতো নষ্ট করো তবে ওই ছেঁড়া জুতোই পরে থাকবে।
২। দরজি	২। তুমি কি বাড়িতে ভাত খেতে পাওনা?
৩। বাবা	৩। ওরে, এই বেলা মুচি ডেকে সেলাই করা।
৪। মা	৪। তুমি আমাকে যত্ন করেছ, তাই আমি তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি।
৫। মাস্টারমশাই	৫। বড়ো অন্যায়, বড়ো অন্যায়। শিগগির সেলাই করো।

৭. **গল্প থেকে অন্তত পাঁচটি ঘটনা খুঁজে নাও এবং সেইসব ঘটনার কারণ পাশাপাশি লেখো :**

ঘটনা	কারণ

৮. একই শব্দ পাশাপাশি বসেছে — এরকম যতগুলি পারো শব্দজোড়া গল্প থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো। একটি করে দেওয়া হলো : জোরে জোরে।

৯. **নীচের শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লিখে তা দিয়ে বাক্য রচনা করো :**

সাহস, দুষ্টু, যত্ন, নামা, আরম্ভ, সম্ভব, কষ্ট, মন্দ, দুর্বল।

শব্দার্থ : জোড়াতাড়া — গোঁজামিল। উৎপাত — উপদ্রব, দৌরাত্ম্য। ঘন্ট — ঘেঁটে ফেলা, এলোমেলো করা। শ্রান্ত — ক্লান্ত। ভোগানি — কষ্ট পাওয়া। স্ফূর্তি — আনন্দ।

১০. **বর্ণ বিশ্লেষণ করো :** সেলাই, চৌকাঠ, সমস্ত, মাতব্বর, মুশকিল।

১১. 'যতীনের জুতো' গল্পের যে কোনো একটি অংশ বেছে নিয়ে সেটির ছবি আঁকো।

১২. **গল্প থেকে উপযুক্ত শব্দ সংগ্রহ করে শূন্যস্থান পূরণ করো :**

১২.১ _____ জোরে কখনই এ বিদ্রোহ দমন করা যাবে না।

১২.২ আমরা গত ছুটিতে সবুজ _____ পিকনিক করতে গিয়েছিলাম।

১২.৩ _____ না করলে অন্যায় করা বেড়ে যায়।

১২.৪ গ্রীষ্মের দুপুরে রঙিন _____ চোখে দিলে আরাম বোধ হয়।

১২.৫ _____ দিঘার সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে।

১৩. **'ক' স্তম্ভের সঙ্গে সংগতি রেখে 'খ' স্তম্ভে বাক্য লেখো :**

ক	খ
১। দুরদুর	
২। সাঁইসাঁই	
৩। বোঁ বোঁ	
৪। মচমচ	
৫। টনটন	
৬। ফিসফিস	

১৪. **নীচের শব্দগুলো থেকে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণ আলাদা করো :**

শব্দ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ
১। ধুতি		
২। খুব		
৩। ছোটো		
৪। কাজে		

১৫. **গল্পটি পড়ে আমরা যা শিখলাম তার অন্তত তিনটি বিষয় তোমার নিজের ভাষায় লেখো।**
(একটি নমুনা দেওয়া হলো।)

১. সব জিনিসই যত্ন নিয়ে ব্যবহার করতে হয়।

২.

৩.

৪.

১৬. নীচের সূত্র অনুযায়ী শব্দছকটি পূরণ করো :

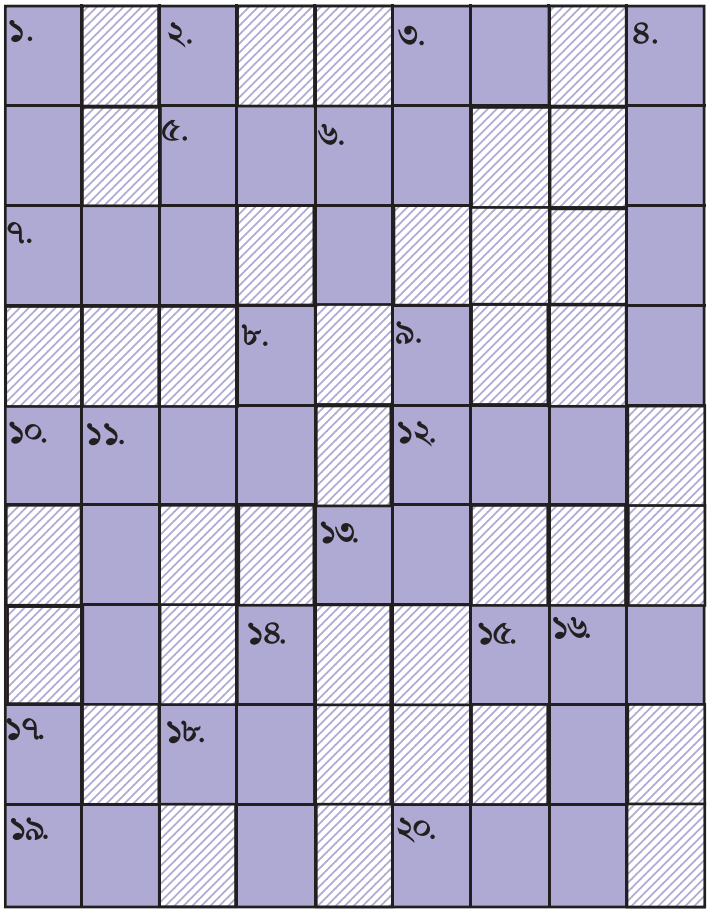

পাশাপাশি

৩। ______ পাড়ানি মাসিপিসি

৫। শিগগির

৭। ______ পত্র

১০। যা দিয়ে লেখা যায়

১২। লাফ দিয়ে

১৩। যার উপর চক পেনসিল দিয়ে লেখা হয়

১৫। ভয়হীনতা

১৮। শিশুদের এতেই আনন্দ

১৯। গৃহ

২০। হাওয়া (সমার্থক শব্দ)

উপর-নীচ

১। যে জামাকাপড় বানায়

২। হাওয়া (সমার্থক শব্দ)

৩। ছেলেরা যা আকাশে ওড়ায়

৪। ব্যথায় পা ______ করছে

৬। জামাকাপড় ছিঁড়ে গেলে এটা দেখা যায়

৮। বিদ্যালয়

৯। বইয়ের জামা

১১। নব

১৪। সূঁচ-সুতো দিয়ে যা করা হয়

১৬। সহসা

১৭। পিতা

সমাধান : পাশাপাশি— ১. ঘুম ৫. তাড়াতাড়ি ৭. জিনিস ১০. পেনসিল ১২. লাফিয়ে ১৩. শ্লেট ১৫. সাহস ১৮. খেলা ১৯. বাড়ি ২০. মরুৎ।
উপর-নীচ— ১. দরজি ২. বাতাস ৩. ঘুড়ি ৪. টনটন ৬. তাপ্পি ৮. স্কুল ৯. মলাট ১১. নতুন ১৪. সেলাই ১৬. হঠাৎ ১৭. বাবা।

১৭. ঘুড়ির সাহায্য না পেলে যতীন কোন পথে বাড়ি ফিরত — সেই পথটি বের করো :

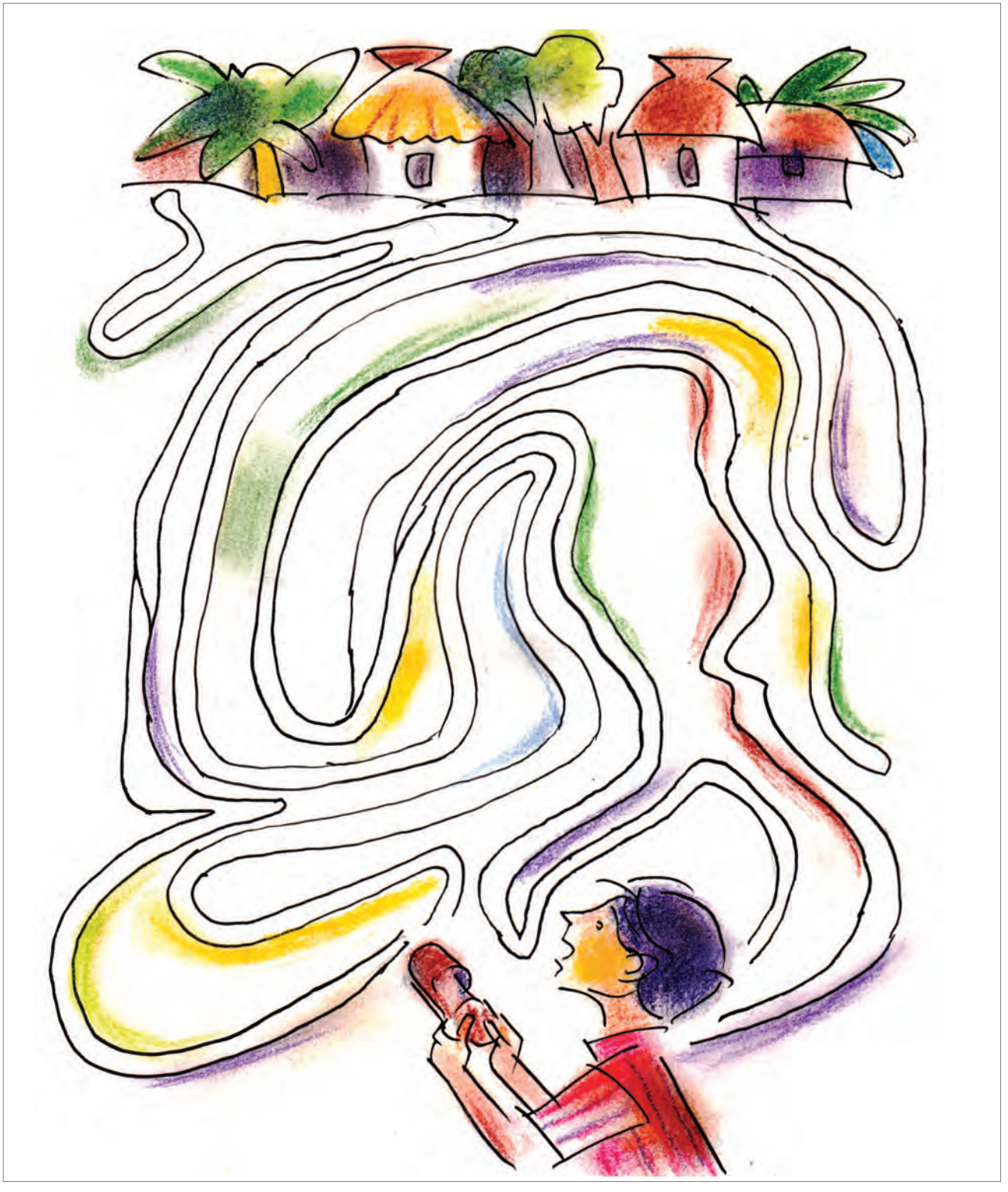

মিলিয়ে পড়ো	সুকুমার রায়ের গল্প পড়লে। এর আগে পড়েছ সুকুমার রায়ের কবিতা। এখানে রইল তাঁরই লেখা একটি সরস রচনা। তোমরা বিদ্যালয়ে এই খেলার চর্চা করতে পারো।

হেঁয়ালি-নাট্য

সুকুমার রায়

ইংরাজিতে একরকম খেলা আছে, তাকে বলে, 'শ্যারাড' (Charade)। এ খেলা দেখতে হলে এমন কয়েকটি লোক দরকার যারা অন্তত একটু-আধটু অভিনয় করতে পারে। তারপর এমন একটি কথা নিয়ে অভিনয় করতে হবে, যাকে ভাগ করলে দু-তিনটা কথা হয়, যেমন Handsome (Hand ও Some বা Sum) অথবা Carpet (Car বা Cur ও pet)। অভিনয়ের প্রথম দৃশ্যে কথার প্রথম অংশটি, দ্বিতীয় দৃশ্যে দ্বিতীয় অংশটি, তৃতীয় দৃশ্যে সমস্ত কথাটি বুঝিয়ে দিতে হবে; যাঁরা দর্শক থাকবেন তাঁরা সব দেখেশুনে বলবেন, কোন কথাটি নিয়ে অভিনয় করা হলো। যদি কোনো কথার তিনটি অংশ থাকে—যেমন হাঁস পা-তাল, তা হলে অবশ্য চারটি দৃশ্যে অভিনয় করতে হবে। বাংলাতেও 'শ্যারাড' বা 'হেঁয়ালি নাট্য' হতে পারে; একটা বাংলা দৃষ্টান্ত দিলে বোধহয় কথাটা পরিষ্কার হয়। মনে করো 'বৈঠক' কথাটা নিয়ে অভিনয় হচ্ছে।

প্রথম দৃশ্য—'বই'। একজন লোক দিনরাত খালি বই নিয়ে ব্যস্ত, কেবলই বই পড়ছে। তার চারিদিকে রাশি রাশি বই ছড়ানো রয়েছে দেখে বিরক্ত হয়ে বলছে, 'তোমার ও পোড়া বইগুলো একটু রাখো দেখি। চলো একটু হাওয়া খেয়ে একবার নরুবাবুর বৈঠকে যাই'। লোকটি অগত্যা রাজি হয়ে বলল, 'আচ্ছা, তোমরা এগোও, আমি এইটা শেষ করেই আসছি।'

দ্বিতীয় দৃশ্য—'ঠক'। একটি ছোট্ট বইয়ের দোকান, তার সামনে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক বইওয়ালাকে ভীষণ গালাগালি দিচ্ছেন। বলছেন, 'চোর বাটপাড় ঠক জোচ্চোর, আগাম টাকাটা নিয়ে এখন বই দেওয়ার বেলায় ফাঁকি দিচ্ছ।' বইওয়ালা বলে, 'সে কী মশাই! কার কাছে টাকা দিলেন?' ভদ্রলোক চটেমটে খুব খানিক শাসিয়ে চলে গেলেন। এমন সময়ে সেই বই-পড়া লোকটি এসেছে; বইওয়ালা তাকে একটি বহুকালের পুরোনো পুঁথি দেখাল—তার অনেক দাম! লোকটি বইখানা কিনে বলল, 'বইটা একটু কাগজে জড়িয়ে বেঁধে দাও তো।' বইওয়ালা 'দিচ্ছি' বলে বইখানা নিয়ে তার বদলে কতগুলো বাজে বটতলার বই বেঁধে দিয়ে বলল, 'এই নিন মশাই।' বই-পড়া লোকটি তখন হাঁ করে অন্য বই দেখছিল, সে কিছুই টের পেল না, বইয়ের প্যাকেট নিয়ে চলে গেল।

তৃতীয় দৃশ্য — 'বৈঠক'। নরুবাবুর বৈঠকে বসে বন্ধুরা বলাবলি করছে, 'আরে, অমুক কী আমাদের বৈঠক একেবারে ছেড়ে দিলে নাকি?' একজন বলল, 'না, সে আজ আসবে বলেছে।'

এমন সময় বই হাতে সেই লোকটির প্রবেশ। সকালের মহা উৎসাহ! একজন বলল, 'এত দেরি হলো যে?' 'আর ভাই, পথে একটা কেতাব কিনতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল'—বলেই বইয়ের ব্যাখ্যা আর প্রশংসা। সকলে দেখতে চাইল, আর কাগজের মোড়ক খুলতেই বেরোল কতগুলো ছেঁড়া নোংরা বটতলার বই। ভদ্রলোক অপ্রস্তুত—সকলের হাস্যকৌতুক—ইত্যাদি।

হেঁয়ালি অভিনয় করতে হলে কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হয়।

১. যে দৃশ্যে যে কথার অভিনয় হচ্ছে তাতে অন্তত একবার সেই কথাটা বলা দরকার! তা বলে বারবার বেশি স্পষ্ট করে বলাটাও ঠিক নয়।

২. যে কথাটার অভিনয় হচ্ছে তার সঙ্গে কিছু অন্য কথা আর অবান্তর অভিনয়ও কিছু কিছু থাকা দরকার। না হলে কথাটা নেহাত সহজে ধরা পড়ে যেতে পারে।

৩. দৃশ্যগুলি বেশি বড়ো না হয়। ছোটো-ছোটো তিনটি দৃশ্য হলেই ভালো।

হেঁয়ালি-নাট্যের উপযোগী কথা বাংলায় অনেক আছে; যেমন—'জলপান' (জল + পান), 'বন্ধন' (বন + ধন), 'কারখানা' (কার + খানা), 'আকবর' (আক + বর), 'বৈকাল' (বই + কাল), 'যমালয়' (জমা + লয়) ইত্যাদি।

আর-একরকমের হেঁয়ালি অভিনয় আছে, তাকে বলে Dumb Charade অর্থাৎ বোবা শ্যারাড। সে খেলায় কথা বলে না, শুধু বায়োস্কোপের মতো হাত-পা নেড়ে কথাগুলোর অভিনয় করে।

ন ই লে

অজিত দত্ত

প্যাঁচ কিছু জানা আছে কুস্তির?
ঝুলে কি থাকতে পারো সুস্থির?
নইলে
রইলে
ট্রাম না চড়ে,
ভ্যাবাচ্যাকা রাস্তায় পড়ে বেঘোরে।

প্র্যাকটিস করেছ কি দৌড়ে?
লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, আর ভোঁ-উড়ে?
নইলে
রইলে
লরিতে চাপা,
তাড়া করে বাড়ি থেকে বাড়িও না পা।

দাঁত আছে মজবুত সব বেশ?
পাথর চিবিয়ে আছে অভ্যেস?
নইলে
রইলে
ভাত না খেয়ে
চালে ও কাঁকরে আধাআধি থাকে হে।

স্থির করে পা দুটো ও মনটা,
দাঁড়াতে পারো তো বারো ঘণ্টা?
নইলে
রইলে
না কিনে ধুতি
যতই দোকানে গিয়ে করো কাকুতি।

হাতে কলমে

অজিত দত্ত (১৯০৭—১৯৭৯) : সাময়িক সাহিত্যপত্র *প্রগতি*-র যুগ্মসম্পাদক ছিলেন। চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেট রচনা করে অজিত দত্ত যথার্থ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শুধুমাত্র কবিতা নয়, ছড়া রচনার ক্ষেত্রেও কবির অনায়াস দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। সহজ, সরল ভাষা ও ভাবে নির্মিত ছড়াগুলি শিশুদের কাছে পরম আদরের। তাঁর রচিত বইগুলি হলো — *কুসুমের মাস*, *পাতালকন্যা*, *নষ্টচাঁদ*, *ছড়ার বই*, *ছায়ার আলপনা*, *জানালা* ইত্যাদি। কবির নিজের ভাষায় 'চলতি পথের ছন্দে লেখা/নতুন দিনের ছড়া' প্রধানত শিশুদের জন্য রচিত। কবি কখনও কখনও রূপকথার জগৎ, আবার কখনও বা বাস্তব জীবন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে শিশুদের উপযোগী ছড়া তৈরি করেছেন।

১. কবি অজিত দত্ত কোন বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?

২. তাঁর লেখা দুটি কবিতার বইয়ের নাম লেখো।

৩. **নীচের এলোমেলো বর্ণগুলি সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো:**

চা বা কা ভ্যা, বু ম ত জ, ধি আ ধা আ, ন দো কা

শব্দার্থ : প্যাঁচ — কৌশল। ভ্যাবাচাকা — হতবুদ্ধি। বেঘোরে — সংকটে পড়া। প্র্যাকটিস — অভ্যাস। ভোঁ-উড়ে — দ্রুত উড়ে যাওয়ার ভঙ্গি। কাকুতি — অনুনয়, মিনতি।

'না কিনে ধুতি' — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন চলছে এবং তার পরেও দীর্ঘকাল কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে পোশাকের আকাল দেখা দিয়েছিল। সেই সময় সরকারি দোকানে নির্দিষ্ট মূল্যে ধুতি-শাড়ি বিক্রি হতো। সেই দোকানগুলিকে সাধারণভাবে *কন্ট্রোলের দোকান* বলা হতো। দীর্ঘ লাইন দিয়ে তবে ধুতি-শাড়ি কেনা যেত। কবিতার শেষ অংশে সেই দুর্ভোগের কথা আছে।

৪. কথা বলার সময় মূল শব্দ কখনও তার চেহারা বদলে ফেলে। যেমন কবিতায় রয়েছে 'নইলে' 'অভ্যেস' 'আধাআধি' ইত্যাদি শব্দ। এদের পাশাপাশি শব্দগুলির প্রকৃত রূপটি লেখো। আরো কিছু শব্দ তুমি খুঁজে নিয়ে লেখো।

৫. **কবিতা থেকে বিশেষণ শব্দগুলিকে খুঁজে নিয়ে বাক্যরচনা করো :** যেমন — সুস্থির, ভ্যাবাচাকা, মজবুত।

৬. **শব্দযুগলের অর্থপার্থক্য দেখাও :**

চাপা/চাঁপা; চড়ে/ চরে; পড়ে/পরে; বাড়ি/বারি; তাড়া/তারা

৭. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

৭.১ ভাত খাওয়ার প্রসঙ্গে কবি পাথর চিবানোর অভ্যেস আছে কিনা তা জানতে চেয়েছেন কেন?

৭.২ 'অপেক্ষা' 'তাড়াহুড়ো', 'দ্রুত গতি' ও 'শারীরিক দক্ষতা'— এই শব্দগুলি তোমার পঠিত কবিতাটিরকোন কোন স্তবকের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত তা শিক্ষকের কাছ থেকে জেনে নাও।

৭.৩ রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে গেলে নিজেকে কীভাবে প্রস্তুত করতে হবে?

৭.৪ বাড়ির বাইরের পৃথিবীতে মানিয়ে চলবার জন্য তুমি নিজেকে কীভাবে প্রস্তুত করবে?

৭.৫ এই কবিতাটি পড়ে যে যে ছবিগুলি তোমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে সেই ছবিগুলি খাতায় এঁকে ফেলো।

৮. **প্রতিশব্দ লেখো :** মজবুত, ভাত, চাল, পা

৯. **বর্ণবিশ্লেষণ করো :** রাস্তা, কুস্তি, মজবুত, কাকুতি

১০. **অর্থ লেখো :** প্যাঁচ, কুস্তি, প্র্যাকটিস, ভ্যাবাচাকা, সুস্থির

১১. **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :** কিছু, সুস্থির, অভ্যেস, আধাআধি, মজবুত।

১২. 'চাল' ও 'বেশ' শব্দদুটিকে আলাদা আলাদা অর্থে ব্যবহার করে বাক্যরচনা করো।

১৩. কবিতায় তুমি কয়টি প্রশ্নবোধক বাক্য খুঁজে পেলে লেখো।

জেনে রাখো :

কলকাতা শহর ও ট্রাম — ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ২৪ ফেব্রুয়ারি কলকতায় প্রথম ট্রাম চলে। তবে নিয়মিতভাবে ট্রাম চলাচল শুরু করে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে। প্রথমে ট্রাম চলত ঘোড়ায়। ঘোড়ার বদলে পরীক্ষামূলকভাবে ১৮৮২ সালে ১১ মাস বাষ্পের ইঞ্জিন দিয়েও ট্রাম চালানো হয়েছে। তারপরে ১৯০২ সাল থেকে বৈদ্যুতিক ট্রামের চলা শুরু। (প্রসঙ্গ সূত্র : *কলের শহর কলকাতা*—সিদ্ধার্থ ঘোষ)

১৪. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

১৪.১ যেখানে কুস্তিগিরেরা অভ্যাস/শরীরচর্চা করেন, সেই জায়গাটিকে বলা হয় _____।

১৪.২ বাংলার একজন বিখ্যাত কুস্তিগির হলেন _____।

১৪.৩ ট্রাম ছাড়া একটি পরিবেশ-বান্ধব যান হলো _____।

১৪.৪ 'প্র্যাকটিস' শব্দটির অর্থ হলো _____।

১৪.৫ মন বলতে বোঝানো হয়ে থাকে _____ কে।

১৫. **বাক্য সম্পূর্ণ করো :**

১৫.১ ট্রামে চড়তে অসুবিধা হবে, যদি _____।

১৫.২ বাড়ি থেকে বেরোনোই মুশকিল, যদি _____।

১৫.৩ ভাত খাওয়া দুষ্কর হবে, যদি _____।

১৫.৪ দোকানে গিয়ে দাঁড়িয়েই থাকতে হবে, যদি _____।

১৫.৫ সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলা যাবে না, যদি _____।

ঘুমপাড়ানি ছড়া

স্বপনবুড়ো

ঘুমে যদি ঢুলেই আসে নয়ন দুটি—
সাঁঝের ফুল আর কে কুড়োবে মুঠি-মুঠি ?
ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি
ওই যে দিয়ে দাঁতে মিশি
ঘুমের কাজল বুলিয়ে আসে গুটি গুটি।
ঘুমিয়ে পড়ে খেলাঘরের পুতুল যত—
রাত বাড়ে, আর ঝিঁঝিঁর ছড়া শুনবে কত ?
চাঁদ যে ঝিমায় আকাশ কোণে
সন্ধ্যাতারা স্বপন বোনে—
শেষ ছড়া মোর ছড়িয়ে দিলাম নে না লুটি।

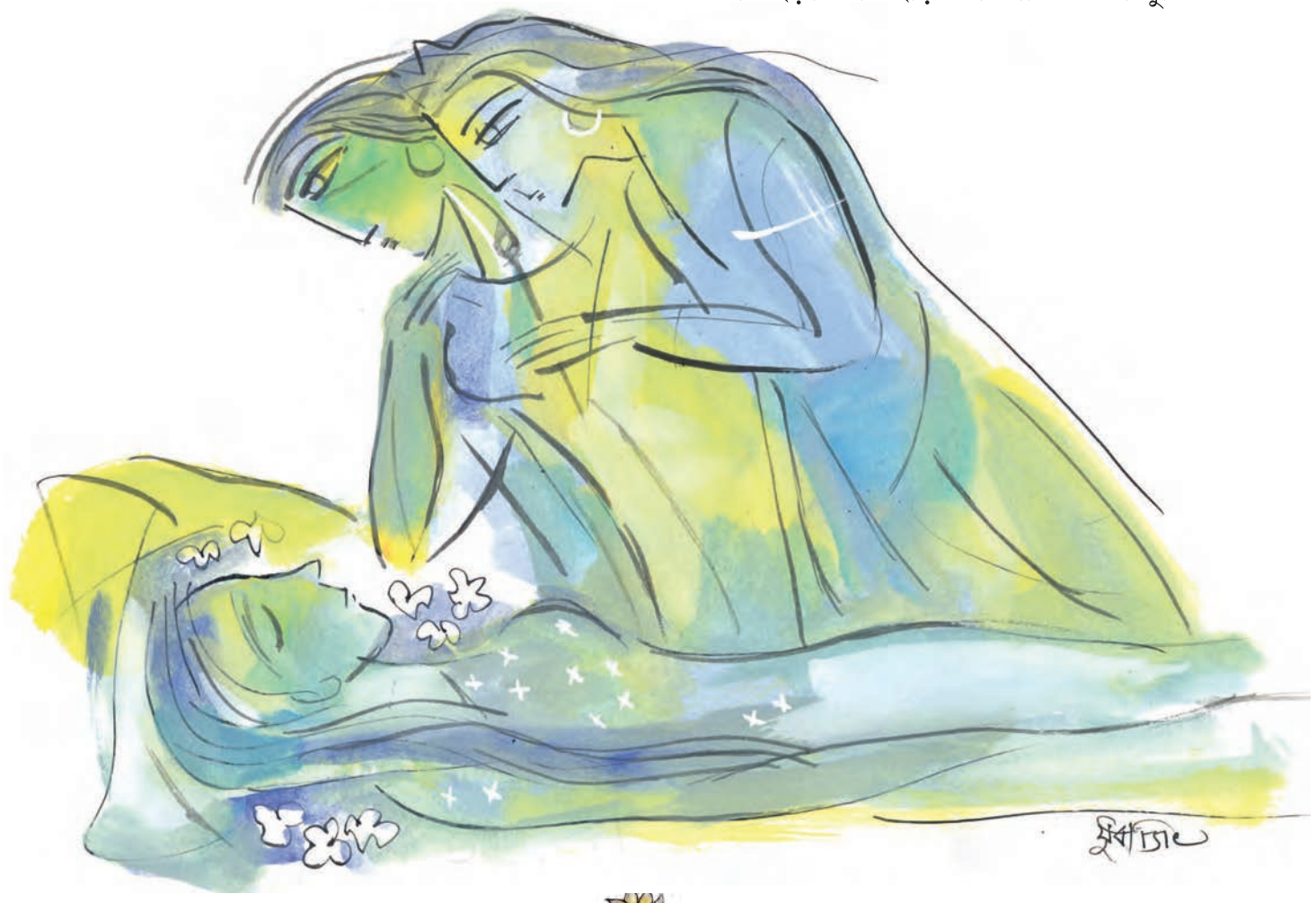

স্বপনবুড়ো (১৯০২—১৯৯৩) : স্বপনবুড়ো ছদ্মনামে লিখতেন অখিলবন্ধু নিয়োগী। ছাত্রাবস্থাতেই *শিশুসাথী* পত্রিকায় *বেপরোয়া* নামক উপন্যাস প্রকাশিত হয়। শিশু ও কিশোরদের জন্য অজস্র ছড়া, কবিতা, গল্প, নাটক ও গান লিখেছেন। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য বইগুলি হলো *ধন্যি ছেলে, ভুতুড়ে দেশ, বাবুই বাসা বোর্ডিং, বাস্তুহারা* প্রভৃতি। তিনি *যুগান্তর* পত্রিকায় *ছোটোদের পাততাড়ি* সম্পাদনা করতেন। ছোটোদের নিয়ে *সব পেয়েছির আসর* গড়ে তুলেছিলেন।

১. অখিল নিয়োগী শিশুদের কাছে কী নামে পরিচিত?

২. তাঁর লেখা একটি বইয়ের নাম লেখো।

৩. **ঠিক শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :** কা__ল, স__তা, __পন, __তুল, খে__র।

৪. **কবিতাটি পড়ে কত জোড়া অন্ত্যমিল খুঁজে পেয়েছ লেখো :**

যেমন— নয়ন দুটি
মুঠি মুঠি

৫. কবিতায় 'মিশি' শব্দটি একটি দ্রব্যের নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দটিকে ক্রিয়াপদ হিসাবে ব্যবহার করে তুমি কতগুলো অর্থে প্রয়োগ করতে পারো লেখো।

৬. **আমরা আমাদের প্রতিদিনের কথাবার্তায় এরকম শব্দবন্ধ ব্যবহার করে থাকি।** যেমন —

দুধের সর গাছের পাতা পুকুরের জল

তোমরা এরকম আরও কয়েকটি শব্দবন্ধ যা আমরা প্রতিদিনের কথাবার্তায় ব্যবহার করে থাকি, লেখো।

_____ _____।

৭. **পরের পঙ্‌ক্তিটি লেখো :**

ঘুম পাড়ানি মাসি-পিসি ঘুমিয়ে পড়ে খেলাঘরের পুতুল যত চাঁদ যে ঝিমায় আকাশ কোণে

_____ _____ _____

৮. 'ছড়া' শব্দটি কবিতায় 'পদ্য' এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই অর্থ ছাড়া 'ছড়া' শব্দটি তুমি আর কী কী অর্থে ব্যবহার করতে পারো, বাক্যে প্রয়োগ করে দেখাও।

মায়াদ্বীপ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় আমরা মামাবাড়ি যেতাম নৌকোয় চেপে। কী যে ভালো লাগত! গাড়ি কিংবা ট্রেন কিংবা এরোপ্লেনের চেয়েও নৌকোয় যাওয়া অনেক আরামের। জলের শব্দ শুনতে শুনতে ঘুম ঘুম ভাব আসে, তাতে অনেক স্বপ্ন দেখা যায়।

আমাদের মামাবাড়িতে অবশ্য নৌকোয় ছাড়া অন্য কিছুতে যাওয়ার উপায়ও ছিল না। রাস্তা-টাস্তা জলেই ডুবে থাকত প্রায় সারা বছর। তাই প্রত্যেক বাড়িতে থাকত নিজস্ব নৌকো।

আমাদের বাড়ি থেকে নদীর ঘাট পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ। সে নদীটা ছোটো, কিন্তু ঘাটের পাশে বাজার বলে সেখানে সবসময় অনেক নৌকোর ভিড়।

আমাদের নিজেদের নৌকোটা ছোটো, সেই নৌকোয় চেপে আমরা স্কুলে যেতাম। সে নৌকোয় বড়ো নদীতে যাওয়া যায় না। তাই আমাদের জন্য মামাবাড়ি থেকে আসত একটা বড়ো নৌকো, তাতে হলুদ রঙের পাল। সে নৌকোর তিনজন মাঝির মধ্যে হেড-মাঝির নাম নাদের আলি, সে কতরকমের গল্প শোনাত আমাদের।

ছোটো নদীটা খানিক দূর গিয়ে একটা বড়ো নদীতে মিশেছে। সে নদীটার নামও খুব মিষ্টি, বাতাসি। খুব একটা বড়ো নয়, দু-দিকের পাড় দেখা যায়। কতরকমের মানুষ, কত পুরোনো গাছ, আর মন্দির, মসজিদ, জমিদারদের বাড়ি। এক জায়গায় শ্মশান, সেখানেও ঘাট বাঁধানো।

এই বাতাসি নদী আবার খানিকটা পরে আরও বড়ো একটা নদীতে এসে পড়ত। সে নদীর নাম পিংলা। কতক্ষণে পিংলা নদী আসবে তার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতাম।

এই পিংলা নদীতে দেখা যেত শুশুক। ইংরেজিতে যাদের বলে ডলফিন। হঠাৎ হঠাৎ হুস করে মাথা তুলেই আবার ডুবে যায় জলে। অনেকটা যেন মানুষের মতন। খুব ছেলেবেলায় আমার মনে হতো জলের নীচে নিশ্চয়ই অনেক মানুষ থাকে। একটু বড়ো হয়ে শুশুক চিনতে শিখেছি।

আমরা চোখ বড়ো করে তাকিয়ে থাকি নদীর দিকে, কখন শুশুক দেখা যাবে। দেখলেই চেঁচিয়ে উঠি। কে-কটা দেখলাম, তাই গুনি। এই নিয়ে প্রতিযোগিতা হতো, প্রত্যেকবারই জিতে যেত আমার ছোটোকাকা। আমি পাঁচটা শুশুক দেখলে ছোটোকাকা দেখত এগারোটা। কিন্তু ছোটোকাকার কথায় আমাদের সবসময় সন্দেহ থেকে যেত। আমি ডানদিকে তাকিয়ে আছি, ছোটোকাকা বাঁদিকে আঙুল তুলে বলে, 'ওই যে, ওই যে একটা।' আমি সেদিকে ফিরে আর দেখতে পাই না।

সবচেয়ে কম দেখতে পান মা। আমরা চেঁচিয়ে উঠলেই মা বলেন, 'কই রে, কই রে? যাঃ, চশমাটা কোথায় গেল?' মা চশমা পরা পর্যন্ত কি শুশুকরা জলের উপর মাথা তুলে বসে থাকবে?

সেবারে মা কোনোক্রমে দেখতে পেলেন একটা মাত্র!

পিংলা নদী দিয়ে একঘণ্টা নৌকো বেয়ে যাওয়ার পর দেখা যেত একটা দ্বীপ। নদীর মধ্যেও যে দ্বীপ থাকে, তা অনেকেই জানে না। এখানে নদী দু-ভাগ হয়ে গেছে, দ্বীপের দু-পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে।

সে দ্বীপে কোনো বাড়ি-ঘর নেই, তবে অনেক গাছ আছে। খুব বড়ো গাছ নয়, ঝোপের মতো, একটা শুধু বড়ো শিমুল গাছ অনেক দূর থেকে দেখা যায়।

আমি নাদের আলিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'নাদের দাদা, ওই দ্বীপটার নাম কী?'

নাদের আলির মাথায় ঝাঁকড়া, ঝাঁকড়া চুল, গালে কাঁচাপাকা দাড়ি। সবসময় তার ঠোঁটে হাসি লেগে থাকে। সে বলল, 'এমনিতে তো কিছু নাম নাই, তবে আমরা বলি মায়াদ্বীপ।'

ছোটোকাকা বলল, 'ভালো নাম দিয়েছ। মায়াদ্বীপই বটে। মাঝে-মাঝে অদৃশ্য হয়ে যায়।'

সে কথা শুনে আমার প্রথম মনে হলো, দ্বীপটা কী আকাশে উড়ে যায় নাকি?

তা অবশ্য নয়। যে বছর খুব বৃষ্টি কিংবা বন্যা হয়, সে বছর দ্বীপটা চলে যায় জলের তলায়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'জলে ডুবে যায়? এত যে গাছ রয়েছে, সেগুলোর কী হয়?'

নাদের আলি বলল, 'এইসব গাছ পানির মধ্যেও অনেকদিন বেঁচে থাকে। দ্বীপটা যখন আবার জেগে ওঠে, তখন দেখা যায় অনেক গাছই ঠিকঠাক আছে।'

ছোটোকাকা বলল, 'শুধু মাথা উঁচু করে থাকে শিমুল গাছটা। তখন তো দু-দিকের নদী এক হয়ে যায়, শুধু যেন মাঝনদীতে দাঁড়িয়ে থাকে একটা লম্বা গাছ।'

আমার খুব ইচ্ছে করত, একবার সেই দ্বীপটায় নামতে। পুরো দ্বীপটাই যেন একটা বাগান।

ছোটোকাকা বলল,'না, না, ওখানে নামা যাবে না। প্রচুর সাপ, একেবারে কিলবিল করছে।'

কথাটা আমার বিশ্বাস হলো না।

নাদের আলিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'সত্যিই ওখানে সাপ আছে?'

নাদের আলি বলল, 'সে দুটো-একটা থাকতে পারে। কিন্তু ও দ্বীপে পা দিতে নাই। মায়াদ্বীপে ওনারা থাকেন!'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওনারা মানে কারা?'

সে কথার উত্তর না দিয়ে নাদের আলি দু-দিকে মাথা দোলাল। তারপর হঠাৎ দাঁড় বাইবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সেবারে বর্ষাকালে পিংলা নদীতে আমরা দেখেছিলাম মোট সাতটা শুশুক, আর একটা কুমির!

আরও খানিক পরে এল মায়াদ্বীপ। এই দ্বীপের কাছে এলেই বোঝা যায়, আর দেড় ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাব মামাবাড়ি।

সেবারে অনেক ফুল ফুটেছে, এমনকী শিমুল গাছটাও ফুলে ভরতি। ছোটোকাকা আরও শুশুক খুঁজছে, আমি তাকিয়ে আছি দ্বীপটার দিকে।

হঠাৎ চমকে উঠে বললাম, 'ওই তো মায়াদ্বীপে মানুষ নেমেছে!'

ছোটোকাকা বলল, 'কোথায় রে?'

আমি আঙুল তুলে দেখালাম। কয়েকটা ঝোপের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। বড়ো জোর তেরো-চোদ্দো বছর বয়স। ফরসা রং, কোঁকড়া চুল, সে ফুলগাছে হাত বুলোচ্ছে, কিন্তু ফুল ছিঁড়ছে না।

ছোটোকাকা বলল, 'তাইতো, একা একটা মেয়ে ওখানে গেল কী করে? সঙ্গে কেউ নেই?'

নাদের আলি কেমন যেন ভয় পাওয়া গলায় বলে উঠল, 'ওদিকে তাকিও না, তাকিও না, চক্ষু বুজে ফেলো!'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন, ওদিকে দেখব না কেন?'

নাদের আলি নিজে চোখ বুজিয়ে বলল, 'ওনাদের দেখতে নাই।'

অন্য দুজন মাঝিও চোখ বুজে ফেলেছে।

ছোটোকাকা বলল, 'বুঝেছি, মারমেড! জলকন্যা! দেখছিস না, ও মেয়েটার কোমরের দিকটা দেখা যাচ্ছে না।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'মারমেডদের দেখলে কী হয়?'

ছোটোকাকা বলল, 'আমাদের কিচ্ছু হবে না। ওদের কষ্ট হয়। মানুষের দৃষ্টি ওরা সহ্য করতে পারে না।'

মা বললেন, 'তোরা কী দেখেছিস? কই, আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। যাঃ চমশাটা কোথায় গেল!'

মা সবসময় চশমা পরে থাকেন না। আর দরকারের সময় চশমা খুঁজে পান না। চোখ বোজা অবস্থাতেই মাঝিরা জোরে জোরে চালিয়ে দ্বীপটি পার হয়ে গেল। নাদের আলি আবার চোখ খোলার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'নাদেরদা, ও মেয়েটি কি সত্যিই জলকন্যা? তুমি আগেও দেখেছ?'

নাদের আলি বলল, 'আমি তো কখনও দেখি নাই।'

আমি বললাম, 'এই যে একটু আগে দেখলে?'

নাদের আলি দু-দিকে মাথা দুলিয়ে বলল, 'না তো, আমি কিছু দেখি নাই!'

মামাবাড়িতে পৌঁছেই আমি রাঙামাসিকে বললাম, 'জানো, আজ কী হয়েছে? আমরা মারমেড দেখেছি। জলকন্যা!'

রাঙামাসি বললেন, 'আবার গুল ঝাড়তে শুরু করেছিস? এই নীলুটাকে নিয়ে আর পারা যায় না।'

আমার তখন উত্তেজনায় ফেটে পড়ার মতন অবস্থা। আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'না গুল নয়। সত্যি সত্যি মায়াদ্বীপে দেখেছি। ঠিক মানুষের মতো!'

রাঙামাসি বললেন, 'মায়াদ্বীপ আবার কী? ওই নদীর মধ্যে বানভাসি দ্বীপটা? ওখানে কোনো মানুষ যায় না, কখন ডুবে যাবে তার ঠিক নেই!'

আমি বললাম, 'মানুষ নয়, জলকন্যা। আদ্ধেকটা মানুষের মতন। তুমি ছোটোকাকাকে জিজ্ঞেস করো।'

ছোটোকাকা যে এমন বিশ্বাসঘাতক তা আমি জানতাম না।

ছোটোকাকা অম্লান বদনে বলল, 'দূর, মারমেড বলে কিছু আছে নাকি? আমি কিছুই দেখিনি। নীলু বোধহয় একটা কলাগাছ দেখে ভেবেছে—'

আমি প্রবল প্রতিবাদ করে বলতে গেলাম যে সে দ্বীপে মোটেও কোনো কলাগাছ ছিল না। মেয়েটির মুখ স্পষ্ট দেখেছি। কিন্তু অন্য সবাই হাসতে হাসতে আমায় আর কিছু বলতেই দিল না।

আমার আজও দৃঢ় বিশ্বাস আমি একটি জলকন্যাকেই দেখেছি। সে একবার আমাদের দিকে তাকিয়েছিল। হিরের টুকরোর মতন জ্বলজ্বলে তার চোখ। ওরকম চোখ মানুষের হয় না!

শুনেছি, এখন দ্বীপ একেবারেই জলের তলায় চলে গেছে। এমনকী শিমুল গাছটাও আর নেই।

হাতে কলমে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২) : বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। কিশোর বয়সেই কলকাতায় আসেন। কলকাতার জীবন তাঁর লেখায় যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনই অনেক লেখাতে রয়েছে ওপার বাংলার স্মৃতি। *নীললোহিত* ছদ্মনামে অনেক বই লিখেছেন। অজস্র কবিতা, গল্প, উপন্যাসের রচিয়তা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিখ্যাত কয়েকটি সংকলন/রচনাগ্রন্থ হলো —*কাকাবাবু সমগ্র, কিশোর অমনিবাস, গড় বন্দীপুরের কাহিনী, সপ্তম অভিযান, বিজনে নিজের সঙ্গে, আমাদের ছোটো নদী* প্রভৃতি। পাঠ্য রচনাটি তাঁর *বড়োরা যখন ছোটো ছিল* গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

১. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সৃষ্ট কাকাবাবু চরিত্রটির আসল নাম কী?

২. পাঠ্যরচনাটি তাঁর কোন বই থেকে নেওয়া?

৩. **সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ উত্তর দাও :**

৩.১ 'মায়াদ্বীপ' গল্পের কথকের নাম কী?

৩.২ কোন ঋতুতে তার মামাবাড়ি যাওয়ার পথের বর্ণনা গল্পে রয়েছে?

৩.৩ কথকের মামাবাড়ি যেতে হলে কোন কোন নদী পেরিয়ে যেতে হবে?

৩.৪ গল্পে উল্লিখিত বানভাসি দ্বীপটির নাম কী ছিল?

৩.৫ কথকের মায়ের অনেক শুশুক দেখা হয়ে ওঠে না কেন?

৩.৬ নাদের আলির চেহারার কিরূপ বিবরণ গল্পে রয়েছে?

৩.৭ পিংলা নদীর মাঝের সেই দ্বীপে সবচেয়ে লম্বা গাছটি কী ছিল?

৩.৮ ছোটোকাকা কথককে মারমেডদের সম্পর্কে কী জানিয়েছিল?

৩.৯ কথকের মামাবাড়িতে পৌঁছে ছোটোকাকা অম্লান বদনে কী বলেছিলেন?

৩.১০ মায়াদ্বীপের বর্তমান কোন পরিস্থিতির কথা গল্পে রয়েছে?

৩.১১ এই গল্পে কী কী গাছের নাম পেয়েছ তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

৪. **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৪.১ গল্পকথকের কাছে গাড়ি, ট্রেন বা এরোপ্লেনের চেয়েও নৌকোয় যাওয়া অনেক আরামের মনে হয়েছে কেন?

৪.২ 'প্রত্যেক বাড়িতে থাকত নিজস্ব নৌকো।'— এমন বন্দোবস্তের কারণ কী ছিল?

৪.৩ 'সেখানে সবসময় অনেক নৌকোর ভিড়।' — কোন স্থানের কথা এখানে বলা হয়েছে?

৪.৪ গল্পকথকের মামাবাড়ি থেকে যে নৌকো তাঁদের নিতে আসত, সেটির কথা তিনি কীভাবে স্মরণ করেছেন?

৪.৫ 'বাতাসি' নদীতে নৌকো চড়ে যেতে যেতে আশপাশের কীরূপ দৃশ্য দেখা যেত?

৪.৬ 'কতক্ষণে পিংলা নদী আসবে তার জন আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম।' — এমনভাবে অপেক্ষা করার কারণ কী?

৪.৭ 'এই নিয়ে প্রতিযোগিতা হতো।' — কোন প্রতিযোগিতার কথা বলা হয়েছে?

৪.৮ লোকমুখে কোন দ্বীপটি 'মায়াদ্বীপ' নামে পরিচিত? তার এমন নামকরণের সম্ভাব্য কারণ বুঝিয়ে দাও।

৪.৯ 'মায়াদ্বীপে ওনারা থাকেন!' — কাদের প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে?

৪.১০ 'আমার আজও দৃঢ় বিশ্বাস' — কোন দৃঢ় বিশ্বাসের কথা কথক শুনিয়েছেন? ঘটনার এত বছর পরেও কোন ছবি তিনি ভুলতে পারেননি?

৪.১১ এই গল্পে কতজন মানুষের চরিত্র রয়েছে এবং গল্পে তারা কে কোন ভূমিকা পালন করেছেন তা পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদে লেখো।

৪.১২ এই গল্পে মানুষ ছাড়া যে সকল প্রাণীর কথা রয়েছে তাদের নিয়ে একটি অনুচ্ছেদ লেখো।

৫. **নীচের শব্দগুলির বর্ণবিশ্লেষণ করে ব্যঞ্জনবর্ণগুলি কোনটি কোন বর্গের—তা ছক করে তার ঠিক ঠিক ঘরে বসাও :**

নদী, মাথা, মতন, অনেক, ছোটোকাকা, ডানদিক।

৬. তুমি কিছুটা রেলপথে, কিছুটা জলপথে এবং কিছুটা হাঁটাপথে কোথাও বেড়াতে গিয়েছিলে। এই বেড়ানো তোমার কেমন লেগেছে তা তোমার ডায়ারির পাতায় দিনলিপির আকারে লেখো।

৭. **দুটি করে বাক্যে যুক্ত হয়ে নীচের বাক্যগুলি তৈরি হয়েছে। তুমি বাক্য দুটিকে আলাদা করে লেখো :**

৭.১ হঠাৎ হঠাৎ হুস করে মাথা তুলেই আবার ডুবে যায় জলে।

৭.২ নদীর মধ্যেও যে দ্বীপ থাকে, তা অনেকেই জানে না।

৭.৩ নাদের আলি আবার চোখ খোলার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম।

৮. 'মারমেড'-এর মতো অলৌকিক কিংবা বাস্তবে যাঁদের অস্তিত্ব নেই—যারা থাকে শুধু কল্পনায়—এমন কিছু উদাহরণ তুমি সংগ্রহ করে লেখো।

৯. **নীচের শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লেখো ও তা দিয়ে বাক্যরচনা করো :**

ঘুম, ভিড়, অধীর, হিংস্র, প্রবল, স্পষ্ট, দৃঢ়।

১০. সর্বনামের প্রয়োগ রয়েছে এমন পাঁচটি বাক্য গল্পটি থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো।

১১. 'হেড-মাঝি' — শব্দবন্ধটিতে ইংরাজি ও বাংলা শব্দের সমন্বয় ঘটেছে। এমন পাঁচটি শব্দ তুমি তৈরি করো।

১২. **নীচের বাক্যগুলিতে বিশেষণ চিহ্নিত করো :**

১২.১ আমাদের জন্য মামাবাড়ি থেকে আসত একটা বড়ো নৌকো।

১২.২ সবচেয়ে কম দেখতে পান মা।

১২.৩ ভালো নাম দিয়েছে।

১২.৪ প্রচুর সাপ, একেবারে কিলবিল করছে।

১২.৫ শুধু মাথা উঁচু করে থাকে শিমুল গাছটা।

১২.৬ আমার আজও দৃঢ় বিশ্বাস আমি একটি জলকন্যাকেই দেখেছি।

১৩. ঘটনাগুলির পাশাপাশি কারণ খুঁজে নিয়ে লেখো :

১৩.১ মামাবাড়ি থেকে আসত একটা বড়ো নৌকো।

১৩.২ ছোটোকাকার কথায় আমাদের সবসময় সন্দেহ থেকে যেত।

১৩.৩ ছোটোকাকা বলল, 'না না, ওখানে নামা যাবে না।"

১৩.৪ নাদের আলিকে জিজ্ঞেস করলাম 'সত্যিই ওখানে সাপ আছে?'

১৩.৫ অন্য দুজন মাঝিও চোখ বুজে ফেলেছে।

১৪. শব্দযুগলের অর্থপার্থক্য দেখাও :

দ্বীপ/দীপ, অন্য/অন্ন, বান/বাণ, কাচা/কাঁচা, ভাল/ভালো, শাপ/সাপ

শব্দার্থ ও টীকা : বিশ্বাসঘাতকতা — বিশ্বাস ভাঙে যে, বেইমান। অম্লান — ম্লান নয় যা, অমলিন। দ্বীপ — চারিদিকে জলবেষ্টিত স্থল। শুশুক/ডলফিন — স্তন্যপায়ী জলজন্তু বিশেষ, সাধারণত সমুদ্রে বসবাস করে, কখনো কখনো স্রোতের ধাক্কায় নদীতে ঢুকে পড়ে, নিরীহ স্বভাবের প্রাণী। শোনা যায়, দিগভ্রান্ত জাহাজ ও নৌকার নাবিকদের পথ চিনতে সাহায্য করে। বহু গল্প, উপন্যাসে শুশুকের সহৃদয়তার কাহিনি প্রচলিত আছে। মারমেড — মারমেড অর্থাৎ জলকন্যাদের বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এদের সাধারণত সমুদ্রের নির্জন দ্বীপে দেখতে পাওয়া যায় বলেই জনশ্রুতি। জলকন্যাদের শরীরের ওপরের অংশ সুন্দরী নারীর হলেও নীচের অংশ মাছের মতো।। নাবিক ও মাঝিমাল্লাদের মুখে মুখে জলকন্যাদের কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ভালো-মন্দ দু-ধরনের কাল্পনিক গল্পই প্রচলিত আছে।

১৫. 'রাস্তা-টাস্তা' — শব্দবন্ধে প্রথম অংশে যেমন নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে, পরের অংশের তা নেই। তুমি এমন পাঁচটি শব্দবন্ধ তৈরি করো।

১৬. 'পাল' ও 'ঘাট' এই শব্দদুটিকে দুটি পৃথক অর্থে ব্যবহার করে বাক্যরচনা করো।

১৭. নীচের কোন বাক্যে কোন ভাব প্রকাশ পেয়েছে লেখো :

(প্রশংসা/বিস্ময়/প্রশ্ন/নিষেধ/সংশয়)

১৭.১ কী যে ভালো লাগত!

১৭.২ সে নদীটার নামও খুব মিষ্টি, বাতাসি।

১৭.৩ অনেকটা যেন মানুষের মতো।

১৭.৪ যা চশমাটা কোথায় গেল?

১৭.৫ না, না ওখানে নামা যাবে না।

১৮. নীচে চারটি ছবি আছে। এই চারটি ছবিকে নিয়ে তুমি নিজের ভাষায় একটি অনুচ্ছেদ লেখো :

ঘুম-ভাঙানি

মোহিতলাল মজুমদার

ফুটফুটে জোছনায়
জেগে শুনি বিছনায়
বনে কারা গান গায়,
ঝিমি-ঝিমি ঝুম-ঝুম—
‘চাও কেন পিটি-পিটি ?
উঠে পড়ো লক্ষ্মীটি
চাঁদ চায় মিটিমিটি
বনভূমি নিঝঝুম !

ফাল্‌গুনে বনে বনে
পরিরা যে ফুল বোনে,
চলে এসো ভাই-বোনে,
চোখ কেন ঘুম-ঘুম?'
জানালায় মুখ দিয়ে
দেখি, সাদা জোছ্‌নায়,
পাতাগুলো হলো কী এ!
রুপোলিতে রোজ নায়!
'ওগো শোনো কান পেতে,
মোরা আছি গানে মেতে,
ছোটো ছোটো লণ্ঠন
গায়ে গায়ে ঠন-ঠন,
ঝকমকে পল্টন—
আমোদের রোশনাই!
ঘোর ঘোর এই আলো—
আবছায়া বাসি ভালো,
ঘুরে উড়ে গান গাই
খুশদিল, হুঁশ নাই!'

চুপি চুপি ভয়ে ভয়ে
জোছ্‌নায় আবছায়,
যেই গেনু হেঁট হয়ে
জুতো মোজা দিয়ে পায়—
নিবে গেল রোশনাই,
পরিদের খোঁজ নাই,
কই গান? কই সুর?
শোনা যায় ফুরফুর
বাতাসের ঝুরঝুর
বাইরেটা ফ্যাকাশে!
ডানায় শিশির মাখি
এতখন শ্যামা পাখি
করছিল ডাকাডাকি,
—ভোর হয় আকাশে।

মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮—১৯৫২) : রবীন্দ্রনাথের সমসময়ে যাঁরা এক স্বতন্ত্র ধারার খোঁজে নতুন ধরনের কবিতা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কবি মোহিতলাল মজুমদার। তাঁর আদিবাড়ি হুগলি জেলার বলাগড় গ্রামে। পিতার নাম নন্দলাল মজুমদার। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হলো *স্বপনপসারী, বিস্মরণী, স্মরগরল, হেমন্ত গোধূলি, ছন্দ চতুর্দশী* এবং প্রবন্ধগুলি হলো *আধুনিক বাংলা সাহিত্য, জীবন জিজ্ঞাসা, সাহিত্য বিচার* ইত্যাদি। কবি মোহিতলাল শেষ জীবনে কিছুদিন *বঙ্গদর্শন* (নবপর্যায়) ও *বঙ্গভারতী* নামক সাময়িকপত্র সম্পাদনা করেছিলেন।

১. মোহিতলাল মজুমদারের লেখা দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

২. তাঁর সম্পাদিত দুটি পত্রিকার নাম লেখো।

৩. পূর্ণিমায় ফুট্‌ফুটে জোছনা যেমন, তেমনই ____ অন্ধকার, অমাবস্যায়।

৪. 'পিটিপিটি' ও 'মিটিমিটি' তাকানোর অর্থ হলো ____ ও ____।

৫. 'লক্ষ্মীটি' শব্দটি কবিতায় যে অর্থে ব্যবহার হয়েছে ____

৬. **কবিতায় কিছু শব্দ উচ্চারণে তার মূল চেহারা থেকে বদলে গেছে। বদলে যাওয়া চেহারার পাশাপাশি মূল শব্দগুলি লেখো :**

জোছনা —	বিছনা —	নিঝঝুম —
আবছায় —	নিবে —	শ্যামা-পাখি —

৭. **কবিতা থেকে ধ্বনাত্মক শব্দগুলি খুঁজে নিয়ে তা দিয়ে স্বাধীন বাক্য রচনা করো :**

৮. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৮.১ কবিতায় কোন ঋতুর কথা রয়েছে?

৮.২ গান গেয়ে কারা ডাকে?

৮.৩ জানালায় মুখ বাড়িয়ে বাইরে কী দেখা গেল?

৮.৪ পাতাগুলোকে রুপোলি লাগছে কেন?

৮.৫ 'ওগো শোনো কান পেতে'— কান পাতলে কী শোনা যাবে?

৮.৬ 'চুপি চুপি ভয়ে ভয়ে' কবিতার কথক কোন কাজ করতে চায়?

৮.৭ তার উদ্দেশ্য সফল হলো কি?

৯. **'ভিজে জবজবে-র মতো আর কোন কোন শব্দ পাশাপাশি পাতায় লিখতে পারো তা কবিতাটি থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো।**

১০. **নীচের পঙ্‌ক্তিগুলিতে 'বনে', বোনে' 'বোনে' শব্দ তিনটি উচ্চারণে এক হলেও অর্থে আলাদা। এই তিনটি শব্দের অর্থ লেখো এবং তা দিয়ে বাক্য রচনা করো :**

ফাল্গুনে বনে <u>বনে</u>
পরীরা যে ফুল <u>বোনে</u>
চলে এসো ভাই <u>বোনে</u>

শব্দার্থ : নায় --- স্নান করে। লণ্ঠন --- কাচ দিয়ে ঘেরা বাতিবিশেষ। পল্টন --- সৈন্যদল। আমোদের রোশনাই— আনন্দের আলো। খুশদিল — আনন্দিত হৃদয় বা মন। হুঁশ — জ্ঞান, চেতনা।

১১. গায়, চায়, বাসি, নায়, ঘোর, সুর — এই শব্দগুলিকে দুটি অর্থে ব্যবহার করে আলাদা আলাদা বাক্য লেখো।

১২. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

১২.১ কবিতায় কথক রাত জেগে বাইরে কী দেখে?

১২.২ কবিতায় বর্ণিত বনভূমি নিঝঝুম কেন?

১২.৩ 'মোরা আছি গানে মেতে' — এখানে 'মোরা' বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে? তারা গান গেয়ে কী বলেছিল?

১২.৫ কথক চুপি চুপি জুতোমোজা পায়ে দিয়ে বাইরে যেতে কী ঘটনা ঘটল তা নিজের ভাষায় লেখো।

১২.৬ এমনই কোনো এক জ্যোৎস্না রাতে জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে তোমার বিছানায় পড়ছে। তোমার ঘুম আসছে না। এই জ্যোৎস্না রাতে তোমার নিজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তুমি কয়েকটি বাক্য লেখো।

শিখন পরামর্শ

- জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা -২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন-২০০৯ নথি দুটিকে ভিত্তি করে নতুন পাঠ্যপুস্তকটি (চতুর্থ শ্রেণির বাংলা) রূপায়িত হলো। বইটির পরিকল্পনায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে শ্রেণিশিখনের পূর্বে শিক্ষক/শিক্ষিকা সযত্নে পুরো বইটি পড়ে নেবেন।

- পাঠ্য এই বইটির ভাবমূল (Theme) 'রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ও খেলার জগৎ'। নানা ছড়ায়, কবিতায়, গানে, গল্পে, নাটকে তুলে ধরা হয়েছে দেশ-বিদেশের রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনি। প্রকৃতি-সংলগ্ন বিভিন্ন ধরনের মানুষের প্রসঙ্গ যেমন এসেছে তেমনই পল্লিবাংলার নদীর ধার, সবুজ অরণ্যানীর নিবিড় ছায়ায় ঢাকা মেঠো পথ ধরে শিশু-কিশোরের অভিযান, প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধুত্ব, উদার মাঠে-ঘাটে হই হই করে খেলে বেড়ানো ছোটোদের ছবি উঠে এসেছে এই বই-এর পাতায় পাতায়। প্রকৃতি-স্বদেশ-স্বাধীনতা বিষয়ক গান, মনীষী ও বিপ্লবীদের জীবনকথা, দুঃসাহসী মানুষের বিশ্বভ্রমণের অভিনব অভিজ্ঞতার অপূর্ব বিবরণ আর চারদেয়ালের সীমানা ছাড়িয়ে খোলা আকাশের নীচে খেলে বেড়ানো প্রাণচঞ্চল শিশুদের কলতানে সমৃদ্ধ এই বইটি।

- এই বইটির 'হাতে কলমে' অংশটি বিশদ এবং বিস্তৃত। কেননা এই 'হাতে কলমে' অংশটিতে CCE পুস্তিকার বিভিন্ন দিকনির্দেশগুলি অনুসৃত হয়েছে। প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের বিভিন্ন সূচক যেমন এই সমস্ত 'হাতে কলমে' অংশে ব্যবহার করা যাবে তেমনই পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যেরও প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ মুক্ত চিন্তা চর্চার পরিসর (Open Ended Learning Task), বিভিন্ন অর্জিত সামর্থ্যগুলি সম্পূর্ণ শিক্ষাবর্ষ জুড়ে চর্চার সুযোগ গড়ে উঠবে। শিক্ষিকা/শিক্ষকদের মূল্যায়ন বিষয়ে যাবতীয় অস্পষ্টতা দূর করতেই এই প্রয়াস। শিক্ষিকা/শিক্ষকেরা তাই চতুর্থ শ্রেণির বাংলা বইয়ের 'হাতে কলমে' অংশটি একটি নমুনা হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।

শিক্ষাবর্ষে পাঠপরিকল্পনার সম্ভাব্য সময়সূচি ও পাঠক্রম :

মাসের নাম		পাঠের নাম	মন্তব্য
জানুয়ারি	প্রথম পর্যায়	সবার আমি ছাত্র, নরহরি দাস, কোথাও আমার	প্রকৃতির শিক্ষা ও আত্মপ্রত্যয়।
ফেব্রুয়ারি		তোত্তো-চানের অ্যাডভেঞ্চার, বনভোজন, ছেলেবেলার দিনগুলি	বন্ধুত্ব, দলগত খেলা, মিলেমিশে থাকতে শেখা।
মার্চ		মালগাড়ি, বনের খবর (দু চাকায় দুনিয়া), বিচিত্র সাধ	রোমাঞ্চকর অভিযান ও মনের ইচ্ছা পূরণ।
এপ্রিল	দ্বিতীয় পর্যায়	আমাজনের জঙ্গলে (সত্যি চাওয়া), আমি সাগর পাড়ি দেবো, দক্ষিণমেরু অভিযান (বহু দিন ধরে),	দেশ-বিদেশে অভিযান ও অকুতোভয়তা ।
মে		আলো, বর্ষার প্রার্থনা	ভয়কে জয় করার শিক্ষা।
জুন ও জুলাই		অ্যাডভেঞ্চার বর্ষায়, খরবায়ু বয় বেগে, আমার মা-র বাপের বাড়ি (নদীপথে), দূরের পাল্লা	মাঠে ঘাটে খেলে বেড়ানোর আনন্দ ও শৈশবের রোমাঞ্চ।
আগস্ট	তৃতীয় পর্যায়	বাঘা যতীন, আদর্শ ছেলে, উঠো গো ভারতলক্ষ্মী	স্বদেশপ্রীতি ও স্বাধীনতার আনন্দ।
সেপ্টেম্বর		যতীনের জুতো (হেঁয়ালি নাট্য), নইলে	মজার খেয়াল।
অক্টোবর ও নভেম্বর		ঘুম পাড়ানি, মায়াদ্বীপ, ঘুম-ভাঙানি	কল্পনার আনন্দ।

* সুবিনয় রায়চৌধুরীর 'ছবির ধাঁধা' নামক অংশটি গোটা শিক্ষাবর্ষ জুড়ে আনন্দপাঠের অংশ হিসেবে শিক্ষিকা/শিক্ষকেরা ব্যবহার করবেন।